॥ ৫ ॥

**আত্মচরিত ॥**

আত্মজীবনী রচনায় শিবনাথ বরাবর অনিচ্ছুক ছিলেন। এমনকি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবী শিবনাথের জীবনী লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শিবনাথ আপত্তি জানিয়ে লিখেছিলেন, 'ছি ছি এমন কাজ করিও না।..... আমার আবার জীবনচরিত লেখা হইবে ভাবিলেও আমার লজ্জা হয়।'[১] স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শিবনাথকে আত্মজীবনী রচনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁকে লিখিত কবির একটি চিঠিতে আমরা এই ইঙ্গিত পাই। রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে লেখা পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে লিখেছিলেন[২] 'নিজের জীবনবৃত্ত লিখিতে আপনি যখন অনিচ্ছুক, তখন আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলাম। এক্ষণে অবসর মত ভারতীর জন্য মাঝে মাঝে কিছু প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহায্য করিলে বাধিত হইব।' পত্র রচনার তারিখ ৮ই শ্রাবণ ১৩০৫। এই পত্রটি থেকে আত্মচরিত রচনায় শিবনাথের নিস্পৃহতা লক্ষ্য করা যায়।

এই প্রাথমিক নিস্পৃহতা সত্ত্বেও শিবনাথ স্বীয় জীবনচরিত মৃত্যুর এক বছর পূর্বে প্রকাশ করে গেছেন। এর দুটি কারণ অনুমান করি। এক রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ ও দুই লাবণ্যপ্রভা বসুর সাক্ষাৎ তাগিদ—যাঁকে শিবনাথ জীবনে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন বলে তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরীতে উল্লেখ করেছেন। হেমলতা দেবী লিখেছেন, 'তাঁরই বিশেষ অনুরোধে শিবনাথ "আত্মজীবনী" লিখিতে আরম্ভ করেন।'[৩]

অবশ্য লাবণ্য দেবী কখন এই প্রকার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তা আমাদের জানা নেই। তবুও রবীন্দ্রনাথের অনুরোধের প্রায় চার বছর পরে তিনি অপ্রকাশিত 'আত্মচরিতের খসড়া' (যাকে আমরা অন্যত্র হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা নামে উল্লেখ করেছি) রচনা করতে আরম্ভ করেন পুত্র প্রিয়নাথ কর্তৃক প্রদত্ত একটি খাতায়। রচনারম্ভের তারিখ ২৯.১১.১৯০২। এটি সমাপ্ত হয় ১লা ডিসেম্বর ১৯০৬ তারিখে।

১। হেমলতা দেবী, গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন, শিবনাথ-জীবনী।
২। পত্রটির মুদ্রিত প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৩, পৃঃ ৬৭।
৩। শিবনাথ-জীবনী, পৃঃ ২৮৪।

কিন্তু এর মধ্যেই তিনি প্রকাশিত 'আত্মচরিত' রচনায় হাত দেন বলে অনুমান করি। ৩.৯.১৯০৩ তারিখের অপ্রকাশিত ডায়েরীতে শিবনাথ লিখেছেন, 'বেড়াইয়া আসিয়া আমার জীবনচরিতের অনেকটা লিখিলাম।' রচনা-সমাপ্তির তারিখ আত্মচরিতে দেওয়া আছে ৫ই জুন ১৯০৮। কিন্তু ডায়েরী পাঠে জানতে পারি যে, অন্ততঃ ২৩এ জুন ১৯০৮ পর্যন্ত 'আত্মচরিত' রচিত হয়েছিল।[১] তারপর তিনি ৩০এ জুন তারিখে যাঁর একান্ত অনুরোধে এই আত্মচরিত লেখা হয়েছিল, তাঁকে পাণ্ডুলিপিটি পাঠের জন্য দিয়ে আসেন, 'আজ প্রাতে লাবণ্যকে আত্মজীবনচরিতখানা দিয়া আসিলাম।'[২] এরও বহু পরে সম্ভবতঃ মুদ্রণের প্রয়োজনে তিনি আত্মচরিতখানি সংশোধন করেন—'আত্মজীবন কতকটা revise করি।'[৩] আত্মচরিত রচনায় শিবনাথের অনিচ্ছার আরও একটা প্রমাণ যে ১৯০৮ সালের মধ্যে রচিত হলেও গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় আরও দশ বছর পরে। গ্রন্থটি রচনার এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

শিবনাথের আত্মচরিত প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর পূর্বে বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি আত্মচরিত প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী (১৮৯৮) দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী (১৯০৪এ গ্রন্থাকারে), রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯০৯) প্রভৃতি সমধিক উল্লেখযোগ্য। শিবনাথ রাজনারায়ণ বসুর মতই সুলিখিত জীবন-চরিতের নাম আত্মজীবনী না দিয়ে 'আত্মচরিত' লিখেছেন। ডায়েরীতেও বার বার 'আত্মচরিত' কথাটির উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির নামকরণ সঙ্গত হয়েছে; এতে তাঁর চারিত্রিক ভাল-মন্দের কথাই অকপটে আলোচিত হয়েছে।

জীবনী লেখা নির্ভর করে কোন ব্যক্তির জীবনের নানা ঘটনাকে শিল্পসম্মতভাবে একত্রে নিবদ্ধ করার কৌশলের উপর। কিন্তু আত্মচরিত রচনার মূল প্রেরণা হল, আত্মোপলব্ধি। সেই আত্মোপলব্ধিকে প্রমূর্ত করতে

১। 'অদ্য আমার সুলিখিত জীবনচরিতে যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার অনেকটা লিখিয়া ফেলিলাম।'—অপ্রকাশিত ডায়েরী, তারিখ—২৩. ৬. ১৯০৮।

২। তদেব, ৩০. ৬.১৯০৮।

৩। তদেব, ১৭. ৫. ১৯০৯।

হলে নানা উপকরণের প্রয়োজন হয়। তাই আত্মজীবনী রচনার প্রথম শর্ত তথ্যনিষ্ঠা।

শিবনাথ যখন এই আত্মচরিত রচনা শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন বছর। এই বয়সে স্বাভাবিকভাবেই বাল্যকালের স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে আসে। কিন্তু অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী শিবনাথের মানসপটে বাল্যকালের ছবি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত ছিল বলে, আত্মচরিতের প্রথমভাগ তথ্যবহুল ও যথাযথ হয়েছে। তবুও একটা জিনিষ লক্ষণীয় যে, আত্মচরিতের প্রথম দিকে সাল-তারিখের উল্লেখের সময় শিবনাথ স্থিরনিশ্চয় হতে পারেন নি। এর কারণ পঞ্চান্ন বছর বয়সে পনেরো বছর বয়সের ইতিহাস লিখতে গিয়ে স্মৃতির উপর তাঁকে বহুল পরিমাণে নির্ভর করতে হয়েছিল।

পূর্বেই একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৮৭৮ সাল থেকেই তিনি ডায়েরী লিখতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে ছেদ পড়লেও প্রায় আমৃত্যু তিনি ডায়েরী লিখেছেন। আত্মচরিত রচনাকালে শিবনাথ এই ডায়েরীগুলি ব্যবহার করেছিলেন এবং একারণেই এই সময় থেকে (১৮৭৮ সাল) আত্মচরিতের বিবরণ যেমন তথ্যসমৃদ্ধ, তেমন সঠিক সনতারিখ যুক্ত। বর্ণনাও তাই অধিক জীবন্ত।

আত্মচরিতের তৃতীয় উপাদান হিসাবে চিঠিপত্রের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এই চিঠিগুলি ব্যবহারের ফলে এক একটি বর্ণনা অত্যন্ত আবেগপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। মাতুল দ্বারকানাথকে লিখিত নিজের পত্র ও পিতার লিখিত বিভিন্ন পত্র শিবনাথ যে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রাক্‌কালের বর্ণনায় ব্যবহার করেছিলেন, তা অনেকটা নিশ্চয় করে বলা যায়।

সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিও শিবনাথের আত্মচরিতের উপাদান কিছুটা পরিমাণে জুগিয়েছিল বলে মনে হয়। এগুলির সাহায্য যে তিনি নিয়েছিলেন, তা বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। যেমন, বাল্যকালের গদ্য-পদ্যাত্মক রচনাগুলির সন্ধান কেন তিনি দিতে পারলেন না, তা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'অবলা-বান্ধবের পুরাতন ফাইল না পাওয়াতে পারি নাই।'[১] এই প্রকার 'সমালোচক' পত্রিকার ফাইলও তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। আত্মচরিতে উল্লিখিত ভ্রমণমূলক বর্ণনাগুলি তিনি

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ২৯।

স্পষ্টত:ই তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নিজের পাক্ষিক কার্যাবলীর বিবরণ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।[১]

এই প্রসঙ্গে আর একটি উপাদান উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে আত্মচরিতের যে খসড়া রচনা করেন, তাকে ভিত্তি করেই আত্মচরিতের অনেক অংশ রচনা করেন। আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য উভয় রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করছি :—

'কলিকাতা শহরের প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সুন্দরবনের উত্তর প্রান্তে মজিলপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা প্রসিদ্ধ জয়নগর গ্রামের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত।···গ্রামখানির ইতিবৃত্ত জানি না, অনুমান করি, এককালে গঙ্গা এই পথে বহমানা ছিল এবং গ্রামখানি গঙ্গার চড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পোর্তুগিজেরা যখন এদেশে আসে তখন এই পথে আসিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচীন বাংলা কাব্যে ও পোর্তুগিজদিগের যাত্রা বিবরণে 'ময়দা' নামে এক গ্রাম এখনো বিদ্যমান আছে। ইহাতে অনুমান করা যায়, পোর্তুগিজেরা এই পথেই আসিয়া থাকিবে। গ্রামের পার্শ্বে মাঠে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভগ্ন জাহাজ ও বোটের নিদর্শনস্বরূপ অনেক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেও অনুমান হয়, এক সময় এই পথে জাহাজাদি চলিত। এইরূপে গ্রামখানি যে বহুকালের নয় তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।'[২]

'আমরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি। আমাদের আদি নিবাস জেলা ২৪ পরগণায়, কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব অনুমান ২৮ কি ৩০ মাইল ব্যবধানস্থিত, মজীলপুর গ্রামে। এই গ্রাম এক্ষণে জয়নগর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, ঐ গ্রামে আমাদের পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা কোথা হইতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই।···গ্রামটি গঙ্গার চড়াতে স্থাপিত ছিল। তাহার উভয় পার্শ্বে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। এখনও মজীলপুর ও জয়নগর এই উভয় গ্রামের মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ডকে গঙ্গার বাদা বলে ; এবং

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের পাক্ষিক কার্যাবলীর বিবরণ তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত হত। শিবনাথ নিজেও একজন প্রচারক ছিলেন, তাঁর কার্যাবলীর বিবরণও পত্রটিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রথম পরিচ্ছেদারম্ভ, পৃঃ ১২।

এখনও আমাদের গ্রামের সমুদয় পুষ্করিণীর জল পবিত্র গঙ্গার জল বলিয়া গণ্য হয়। পর্তুগীজগণ যখন প্রথম এদেশে আগমন করেন, তখন এই পথে আসিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার শৈশবে আমি শুনিয়াছি যে গ্রামের পূর্বভাগবর্তী খালে মাটির মধ্যে জাহাজের নঙ্গর কাছি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।'[১] অথবা,

'১৯০১ সালের গ্রীষ্মকালে আমার পুত্র প্রিয়নাথের বিবাহ হয়। ঐ বিবাহ কটকের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম-বন্ধু মধুসূদন রাওর দ্বিতীয়া কন্যা অবন্তী দেবীর সহিত হয়। এই বিবাহের ফলস্বরূপ অদ্য পর্যন্ত একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে।'[২]

'১৯০১ সালের এপ্রেল মাসে কটকের সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম মধুসূদন রাও মহাশয়ের কন্যা অবন্তী দেবীর সহিত পুত্র প্রিয়নাথের বিবাহ হয়। তাঁহারই গর্ভে প্রিয়নাথের পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে।'[৩]

চরিত্র, দৃষ্টি এবং উপলব্ধির বিভিন্নতা হেতু আত্মজীবনীমূলক রচনার মধ্যেও বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক গিবন, সমাজবিপ্লবী রুশো, কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর প্রকৃতি তাই কখনই এক নয়। অথচ তিনজনেই সত্য প্রচারের ব্রত নিয়েছিলেন। ঐ একই কারণে দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ ও শিবনাথের আত্মচরিতের মধ্যেও পার্থক্য আছে।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী ভগবৎ-উপলব্ধির ইতিহাস। রাজনারায়ণ বসু তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও জীবনাদর্শের একটা সমর্থন দিতে চেয়েছেন 'আত্মচরিতে'। এদিক থেকে তাঁর রচনা Mill-এর Autobiography-র সমগোত্রীয়। 'কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতে' পাই সত্যিকার আত্মজীবনীর রস। Samuel Pepys-এর যে বিখ্যাত ডায়েরী তার অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গি, তার অকপট অথচ আতিশয্যহীন আত্মপ্রকাশ-ক্ষমতার জন্য এতদিন রসিক-চিত্তের প্রশংসা পেয়ে এসেছে, সেই আদর্শেরই একটা সুন্দর নিদর্শন দেখি শিবনাথের আত্মচরিতে। সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্যভাবে অথচ গভীর সহানুভূতির সঙ্গে অল্প কথায় কেমন করে এক একটি চরিত্র-চিত্রকে

১। শিবনাথের 'হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা', প্রথমাংশ।
২। আত্মচরিত, পৃঃ ২৬৩।
৩। 'হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা'. ১২শ স্তবক।

জীবন্ত করে তোলা যায়, তার অনেক দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়েছেন। তা ছাড়া শিবনাথের নিজের জীবনের সাধনাটিরও মূল্য কম নয়। তাঁর পরিজনের ছবি যেমন ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়, তেমনি তাঁর নিজের আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মদানের রূপটিও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যদিও তিনি বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি আত্মপ্রচারের।'[১]

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে ঈশ্বরোপলব্ধির যে কথা গভীর অনুভবের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে, শিবনাথের জীবনীতে তা হয় নি। এর একটা কারণ হল যে, দেবেন্দ্রনাথ যতখানি ঈশ্বরভক্ত, ততখানি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। শিবনাথের ঈশ্বরভক্তি ও আধ্যাত্মিকতায় সন্দেহ প্রকাশের কারণ নেই। কিন্তু তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়েছে সমাজের নানা সংস্কারের কাজে। 'বোধ হয় সেই কারণে আত্মচরিতে তাঁহার আধ্যাত্মিকতার ছবি সেরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, যেরূপ আশ্চর্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে মহর্ষির আত্ম-জীবনীতে।'[২]

শিবনাথ শাস্ত্রী এমন একটা যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে যুগে আপন কর্মচক্রের চতুর্দিকে এক বিদগ্ধ জনমণ্ডলীকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। আত্মচরিতে তিনি আপন মহত্ত্বের চেয়ে এঁদের মহত্ত্বকে বহুগুণিত করে দেখেছেন, ভেবেছেন এঁদের মহত্ত্বই তাঁকে বড় হওয়ার পথে অনুক্ষণ প্রেরণা দিয়েছে। তাই সেই সব বড় মানুষদের কথাই তিনি আত্মচরিতে বড় করে এঁকেছেন। রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, পিতা হরানন্দ বিদ্যাসাগর, মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মাতা গোলোকমণি দেবী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ তাঁর আত্মচরিতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর নিজের কথার চেয়ে পারিপার্শ্বিকের কথা এখানে বড় হয়েছে, শিবনাথ তাই সকলের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

তাছাড়া শিবনাথ একাগ্রভাবে নূতন যুগকে দেখেছেন। সেকারণে

১। সুনীলচন্দ্র সরকার, আমাদের জীবনী সাহিত্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯।

২। গ্রন্থ সমালোচনা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৮৪১ শক, পৃঃ ১৯৭-৯৮।

আপন জীবনের প্রসঙ্গে আপন দেশ-কাল-পাত্রের কথাই বেশি করে বলেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিদিনের ভালমন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে সমসাময়িক ইতিহাসের এক আশ্চর্য সম্বন্ধসূত্র যেন তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মহৎ অনুভব ও রাজনারায়ণ বসুর আঞ্চলিক ভাবাদর্শ যেখানে তাঁদের আত্মজীবনীতে প্রধান হয়ে উঠেছে, সেখানে শিবনাথের আত্মচরিতে প্রধান হয়ে উঠেছে যুগধর্মের পরিচয়।

শিবনাথের আত্মচরিতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর প্রসাদগুণ। এই প্রসাদগুণই রচনাটিকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করেছে। উপন্যাসের সুখপাঠ্যতা বইটির প্রতি পৃষ্ঠায় সঞ্চারিত। বক্তব্য-বিন্যাসের পরিচ্ছন্নতায়, সহজ কৌতুকবোধে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বর্ণনায়, প্রকাশভঙ্গির অকপটতায়, বর্ণনার কালানুক্রমিকতায় ও কাহিনীর সংলাপধর্মিতায় আত্মচরিতটি স্বাদু ও হৃদ্য হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটির আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, লেখকের অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গি। যে নিরপেক্ষতা 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'কে ইতিহাসের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই নিরপেক্ষতা আত্মচরিতেও সুস্পষ্ট। বিরোধী ব্যক্তিরাও তাই শ্রদ্ধার পাত্ররূপে বর্ণিত হয়েছেন। যে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতার ফলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর শিবনাথের মনে কোন্ অনুভূতি আলোড়ন জাগিয়েছিল, আমরা তা একবার স্মরণ করি। 'কি সুখেই ভারত আশ্রমে ছিলাম, আর কি দুঃখই পরে ঘটিল, তাহাই মনে হইত। আমরা পরোক্ষভাবে তাঁহার মৃত্যুর অন্যতম কারণ, এই মনে হইয়া সেই দুঃখ ঘনীভূত হইল। ...৮ই জানুয়ারি প্রাতে তাঁহার আত্মা নশ্বর ধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিল। সে প্রাতে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। বৈকালে তাঁহার মৃতদেহ লইয়া পাদুকাবিহীন পদে সকলের সঙ্গে আমরা অনেকে শ্মশানঘাটে গেলাম, এবং অশ্রুজলে ভাসিয়া এ জীবনের অন্যতম গুরুকে চিতানলে অর্পণ করিয়া আসিলাম।'[১] এই শ্রদ্ধার জন্যই আচার্য-পত্নীর প্রতি কটাক্ষের আশঙ্কায় তিনি আনন্দচন্দ্র মিত্র-রচিত 'কপালে ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি' শীর্ষক পুস্তিকাটির প্রচার জোর করে বন্ধ করে দেন।

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ২০০।

দুঃখ করে তিনি লিখেছিলেন, 'হায়, হায়, দলাদলিতে মানুষকে কি অন্ধ করে!'[১]

এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আত্মসমালোচনা এসে গেছে। তিনি ব্রাহ্মসমাজের অধঃপতনের জন্য আপনাকে দায়ী করে বার বার ধিক্কার দিয়েছেন। 'ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে এই যে নিরাশার বাণী ইহা প্রাণে আবেগের অতিরঞ্জিত' কাজ হলেও এর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাণের আর্তি বারংবার প্রকাশিত হয়ে তাঁকে আরও মহৎ করে তুলেছে। নিজেকে ছোট করতে গিয়ে এমন বড হয়ে যাওয়ার অদ্ভুত শিল্পকর্মের উদাহরণ তাঁর আত্মচরিত।

আত্মচরিতের শেষার্ধকে সুখপাঠ্য ভ্রমণকাহিনীও বলা যায়। কয়েকবার সমগ্র ভারত-ভ্রমণের বর্ণনা ও ইংলণ্ড ভ্রমণের কাহিনী গ্রন্থটিকে ভ্রমণকাহিনীর রসে আপ্লুত করেছে। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ-চরিত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণ গ্রন্থকারের সত্যানুসন্ধিৎসার দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থটি যে ত্রুটিমুক্ত, তা নয়। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে'র মত এই গ্রন্থটিতে সাল-তারিখের ভুল নেই বলা চলে। তবে কোথাও কোথাও কালানুক্রম ভঙ্গ হয়েছে। যেমন, 'পুষ্পমালা'কে তিনি দশম পরিচ্ছেদের ১৮৭৬-৭৭ কালপর্বের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আসলে বইটি ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই প্রকারের সামান্য ত্রুটি অবশ্যই অবহেলা করা যায়।[২]

১। তদেব, পৃ. ১৫০।

২। একথা এ প্রসঙ্গে বলা অবান্তর হবে না যে, গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯২০) সম্পাদনাকালে (যে সংস্করণ থেকে সিগনেট সংস্করণ মুদ্রিত) সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় প্রথম সংস্করণের বহু প্রসঙ্গ ত্যাগ করেছেন। তার মধ্যে কোন কোনটি খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। যেমন ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের অনাগ্রহের প্রসঙ্গ। প্রথম সংস্করণের ২১৮-১৯ পৃষ্ঠায় (সপ্তম পরিচ্ছেদ) দেখি বিদ্যাসাগরকে ইণ্ডিয়ান লীগের সভাপতি হতে বলায় তিনি তার মধ্যে অমৃতবাজারের ঘোষভ্রাতাদের অন্তর্ভুক্তির কথা জেনে বলেন, 'যা। তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতর নিলে কেন?' দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে এই মূল্যবান্ উক্তিটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

॥ ৬ ॥

## ॥ 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' ॥

আত্মচরিতের পরিপূরক একটি রচনা 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' নামে শিবনাথের মৃত্যুর বহুপরে তাঁর পুত্রবধূ অবন্তী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে, এটি প্রকাশ-লক্ষ্য সচেতন রচনা নয়; একটি দিনলিপির[১] মুদ্রিত রূপ।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১৫ই তারিখে) 'মির্জাপুর' নামক জাহাজে রওনা হয়ে শিবনাথ বিলাতে প্রায় ছয় মাস কাল অতিবাহিত করেন। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে তিনি 'রোহিলা' নামক জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ডায়েরীতে ১৫ই এপ্রিল থেকে ২০এ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর দৈনন্দিন লিপি লেখা আছে। অর্থাৎ এতে শিবনাথের প্রায় ছয় মাসের ইংলণ্ডবাসের বিবরণ ও ইংলণ্ড সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত হয়েছে।

শিবনাথের ইংলণ্ড যাবার প্রেরণার কথা এবং ইংলণ্ডে থাকাকালে তাঁর চমৎকার আত্মচিন্তার পরিচয় আমরা এই ডায়েরীতে পাই। ইংলণ্ড যাবার ইচ্ছা শিবনাথ বহুদিন থেকেই লালন করে আসছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড যাবার সুযোগ হওয়ার বহু পূর্বেই তিনি লিখেছেন, 'পুরাতন সংকল্প। সংকল্পটী এই, জগদীশ্বর যদি অনুকূল হন তবে ৩ বৎসর ইউরোপ ও আমেরিকাতে গিয়া থাকিয়া সেখানকার ধর্মজীবন, রীতিনীতি, রাজ্যশাসন ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতির প্রণালী মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়া আসিব। তাহা হইলে এখানে আসিয়া অনেক কাজ করিতে পারা যাইবে। কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে, তাহার পূর্বে আমার সংস্কৃত জ্ঞানটা একবার ঝালাইয়া লওয়া আবশ্যক। এবং এখানকার দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসম্প্রদায়সকল বিষয়ের কিছু কিছু জানা কর্তব্য। নিজের ঘরের কাছের কথা না জানিয়া দূরে জানিতে যাওয়া বাতুলের কার্য। ...তৎপরে ১৮৮৬ সালের প্রারম্ভে ইংলণ্ড যাত্রা করা যাইতে পারে।'[২]

১। অপর একটি খাতাতে ১৫ই জুন থেকে ১২ই ডিসেম্বর ১৮৮৮ পর্যন্ত শিবনাথ তাঁর আধ্যাত্মিক-চিন্তা ও প্রার্থনাদি লিখে রেখেছিলেন; সেটি 'ইংলণ্ড প্রবাসীর আত্মচিন্তা' নামে কয়েক দফায় 'রবিবাসরীয় যুগান্তর' পত্রিকায় ১৯শে মে ১৯৫৭ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২। অপ্রকাশিত ডায়েরী, তারিখ—১০ই এপ্রিল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

শিবনাথের ১৮৮৫ সালে যাবার ইচ্ছা ১৮৮৮ সালে পূর্ণ হয়েছিল। উদ্ধৃত অংশে বিবৃত বিলাত গমনের উদ্দেশ্য 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'তে আরও বিস্তারিত-ভাবে শিবনাথ নিজেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন।[১] এই উপলক্ষ্যে তত্ত্বকৌমুদী লিখেছিল, 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। এখন দেশের যেরূপ অবস্থা ও আমাদের যেরূপ লোকাভাব, তাহাতে আমরা শাস্ত্রী মহাশয়কে কোনমতেই বিদায় দিতে পারিতাম না; বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া অধিকতর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরের কার্য করিতে পারিবেন এই ভরসায় আমরা তাঁহার দূরদেশে যাওয়ার অনুমোদন করিতেছি।'[২] শিবনাথও ঐ সময়ে 'নববর্ষের ভাষণে' বিদায় প্রার্থনা করে বলেন, যে, 'তিনি এই উদ্দেশ্য ও আশা লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন যে সেখানে গিয়া তিনি গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা এবং সেখানকার উন্নতচেতা নরনারীদের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার জীবনের মহাব্রত পালনের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত হইতে পারিবেন।'[৩] —'ইংলণ্ডের ডায়েরী' তাঁর সেই সদিচ্ছারই দৈনন্দিন কাহিনী।

আমরা জানি 'শাস্ত্রী মহাশয়ের বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে বাবু দুর্গামোহন দাসই বিশেষ উদ্যোগী ও উৎসাহদাতা'[৪] ছিলেন। এই দুর্গামোহন শিবনাথকে আমেরিকা পাঠাতেও চেয়েছিলেন। শিবনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে পূর্বেই জানতে পেরেছি যে, তিনি আমেরিকাতেও যেতে চেয়েছিলেন। 'সুবিধা হইলে শিবনাথবাবু আমেরিকাও দর্শন করিয়া আসিবেন। আমরা আশা করি নিরাপদে তিনি এই দূরদেশসকল ভ্রমণ করিয়া আসিয়া এ দেশের রমণীগণের উন্নতিপক্ষে সহায়তা করিতে পারিবেন।'[৫] শিবনাথ আমেরিকা যেতে পারেন নি সম্ভবতঃ আর্থিক কারণে। না হলে হয়ত আমরা 'আমেরিকার ডায়েরী'ও পেতাম।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, শিবনাথ 'ব্রাহ্ম মিশনারীর ও মিশনের কার্য সমুচিতরূপে করিতে আরও সমর্থ'[৬] হবার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন, ভাষা-

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরী, পৃঃ ২৩-২৫।
২। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা, সংবাদ বিভাগ, ১লা বৈশাখ ১৮১০ শক।
৩। তদেব, 'নববর্ষের ভাষণ' অংশ।
৪। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৮১০ শক, সংবাদ বিভাগ।
৫। বামাবোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১২৯৫, মে ১৮৮৮, পৃঃ ১।
৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরী, তারিখ—৬.৫.১৮৮৮, পৃঃ ৩৩।

তাত্ত্বিক বা পণ্ডিত বা দার্শনিক হওয়ার জন্য নয়। কিন্তু এর পশ্চাতে সর্বজনীন মনুষ্যপ্রীতিই সর্বাধিক সক্রিয় ছিল বলে অনুমান করি। রবীন্দ্রনাথ শিবনাথের এই 'মানুষের ভালমন্দ দোষ-গুণ সব লইয়াই তাহাকে সহজে ভালবাসিবার শক্তি'কেই[১] বড় করে দেখেছিলেন। 'ইংলেণ্ডের ডায়েরী'র বহু পৃষ্ঠাতেই এই গভীর মনুষ্যপ্রীতির পরিচয় আমরা লক্ষ্য করি। তাই ইংলণ্ডের মহত্ত্বের ভিত্তি তিনি দেখেছেন ভৃত্যগণকে 'প্লীজ' বলার মধ্যে, মাদ্রাজের বন্দরে ইংরেজগণ কর্তৃক মুটেদের উপর অত্যাচার তাঁকে ব্যথিত করেছিল, 'দানে দয়া ও পাপীর প্রতি প্রেম' যাতে ব্রাহ্মসমাজে অধিকতর সক্রিয় হয়, তার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

'ইংলণ্ডের ডায়েরী' শিবনাথের সাহিত্য-জীবনের নানা সূত্রের ধারক। 'নয়নতারা', 'ছায়াময়ী পরিণয়', 'রঘুবংশ' প্রভৃতি পুস্তকাদির রচনা বিষয়ক নানা নির্দেশ এর মধ্যে লিখিত রয়েছে। শিক্ষা-সম্পর্কীয় বিভিন্ন আন্দোলন এবং ধ্যান-ধারণার কথা এই ডায়েরী পাঠে জানতে পারেন। মদ্যপান-নিবারণ আন্দোলন সম্পর্কে শিবনাথ সেই সুদূর বিদেশেও কত নিরলস ছিলেন, তা আমরা এথেকে জানতে পারি।

শিবনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিক থেকেও 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'র মূল্য আছে। 'ইংলণ্ডে অবস্থানকালে যে তিনি দাদাভাই নৌরজীর সহ-যোগিতায় প্রফেসর ষ্টুয়ার্ট এবং স্মিথ, কেইন, ম্যাকলারেন প্রভৃতি পার্লামেণ্ট সভ্যদিগকে আসামের কুলিদের প্রকৃত অবস্থা গোচর করাইয়া তাঁহাদের দিয়া পার্লামেণ্ট প্রশ্ন করাইয়াছিলেন এ তথ্য এই ডায়েরী প্রকাশের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল।...ইংলণ্ডে অবস্থানকালে 'আসাম কুলী য়্যাক্ট'-এর বিশদ আলোচনা করিয়া শিবনাথ অতি সহজেই উদারপন্থী 'পেল্‌মেল গেজেট'এর সুবিখ্যাত সম্পাদক উইলিয়ম ষ্টেডকে প্রভাবিত করিয়া তাঁহার দ্বারা 'A plea for Slavery in India' শীর্ষক কতকগুলি প্রবন্ধ লিখাইবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।'[২]

'ইংলণ্ডের ডায়েরী'তে সেদেশের তৎকালীন মনীষীবৃন্দের চরিত্রের কিছুটা পরিচয় আছে। মিস্ সোফিয়া ডব্‌সন কলেট ( যাঁকে শিবনাথ কলেট দিদি

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

২। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত ইংলণ্ডের ডায়েরীর ভূমিকা, পৃঃ ২০-২১।

বলতেন ), মিস্ ক্যাথারিন ইম্পে ( যাঁকে শিবনাথ কাথুরাণী বলে ডাকতেন ), প্রফেসর ঈ. বি. কাওয়েল, স্যার মনিয়র-মনিয়র উইলিয়মস্, ফ্রান্সিস নিউম্যান, ডঃ মার্টিনো জেমস্, স্টপফোর্ড ব্রুক প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণের সঙ্গে শিবনাথের সাক্ষাৎকারের এক চমৎকার বিবরণ এর মধ্যে আছে।

ডায়েরীর প্রধান গুণ এর অন্তরঙ্গতা। এই টুকরো লেখাগুলির মধ্যে শিবনাথের অন্তরঙ্গ জীবনের আলেখ্য আছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের তুলনা করে তিনি যে সব মন্তব্য করেছেন, তাদের মূল্য কম নয়। ব্রাহ্ম-সমাজকে কি ভাবে সাধারণের চক্ষে উন্নীত করা যায়, সে সম্বন্ধে শিবনাথের আন্তরিক ভাবনার পরিচয় আছে 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'তে। তাছাড়া তিনি মাঝে মাঝে যেমন আত্মবিচার করেছেন, তেমনি করেছেন ঈশ্বরনির্ভরতার প্রকাশ। কিন্তু শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাই যদি ডায়েরীটির বক্তব্য হত, তা হলে এর আবেদন কখনই সর্বজনীন হত না।

ডায়েরীটির মধ্যে নিঃসন্দেহে তৎকালীন যুগের একটা চিত্র ফুটে উঠেছে। 'ঐ যুগ সমস্ত পৃথিবীতে এক নূতন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা আনিয়া দিয়াছিল এবং সমস্ত মানবসমাজকে আলোড়িত ও নূতন করিয়া গড়িয়াছিল। গড়ার কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা বলা কঠিন। কিন্তু এ কথা বলা যায় যে একটী পথ রচনা করিয়া দিয়া গিয়াছে।'[১] এই সব প্রশস্ত চিন্তার মধ্যে যে এই স্মৃতিলিপির শ্রেষ্ঠমূল্য নিহিত আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।[২]

॥ ৭ ॥

## ॥ শিশুসাহিত্য ও শিবনাথ শাস্ত্রী ॥

প্রাচীন ভারত অধ্যাত্মচর্চা ও দর্শনচর্চার পীঠস্থান ছিল। সেকারণে স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন গল্প-গাথার মধ্যেও নানা দার্শনিক তত্ত্ব এসে প্রবেশ লাভ করত। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বৌদ্ধজাতক, কথাসরিৎসাগর ইত্যাদির মধ্যে গল্পের সঙ্গে তত্ত্বও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

১। ধর্মতত্ত্ব, পুস্তক সমালোচনা, ১লা ও ১৬ই আষাঢ় ১৩৬৫, পঃ ৪৮।

২। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ ইংলণ্ড থেকে ফিরে এলে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় ( পৌষ ১২৯৫ ) 'অভ্যর্থনা' নামে যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি পাঠ করা যেতে পারে।

জীবনধারণের মান ও চিন্তার পার্থক্যহেতু এই গল্পচিন্তার মধ্যেও কালক্রমে নানা পরিবর্তন এসেছে। রূপকথায় দার্শনিক তত্ত্ব বহুল পরিমাণে সরল, সামাজিক ও ব্যবহারিক হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকে ইংরেজ সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এই রূপকথা, ব্রতকথাতেও মার্জনার ছাপ পড়েছে। গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা চিরকালীন বলে গল্প চলে যায়নি, তবে গল্পরসের পাকে ও পরিবেষণে পরিবর্তন ঘটেছে। শিবনাথ শাস্ত্রী এই উনিশ শতকের মানুষ। কিন্তু তিনি এই গল্প প্রবাহের শেষের দিকের ঢেউ বলে তাঁর গল্পগুলির মধ্যে নীতিবাদ ও গল্পরস উভয়ের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

উনিশ শতকের গল্পরসের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল, গল্পরচনার কৌশলে চিন্তাযুক্ততা এবং যাদের জন্য গল্পরচনা, তাদের কথা ভাবা। বিশেষতঃ শিশুদের জন্য তত্ত্বরচনার পরিবর্তে মনোরম রচনার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করছিলেন।

'সখা' ও 'মুকুল' পত্রিকায় শিবনাথ এমনধারা রচনারই চর্চা করেছেন। শুদ্ধ গল্পরস ব্যতীত মনীষীদের জীবনচর্চার মধ্যে শিশুদের সামনে যে একটা আদর্শস্থাপন করা যায়, সেকথা শিবনাথ অন্তরের সঙ্গে অনুভব করতেন বলেই 'সখা' ও 'মুকুল' পত্রিকায় বহু খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তির জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। 'মুকুল' থেকে সংকলিত এমন কয়েকটি শিশুপাঠ্য জীবনীর সংকলন 'স্বনামা পুরুষ'।[১] ছোট গল্পের সংকলনটির নাম 'ছোটদের গল্প'।[২] শিবনাথ-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা অধ্যায়ে এদের কথা আলোচনা করেছি।

শিবনাথ জীবিতকালে একটি শিশুপাঠ্য রচনার সংকলন প্রকাশ করেছিলেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'উপকথা' নাম দিয়ে ৩ ৬৫ পৃষ্ঠার এই সংকলন-খানি ৫টি বিদেশী গল্পের অনুবাদ। 'মুকুল' পত্রিকা প্রসঙ্গেও এর আলোচনা করেছি। ডেনমার্কীয় এই রূপকথাগুলি হ্যান্স-অ্যাণ্ডারসনের কয়েকটি অপূর্ব রূপকথার স্বচ্ছ অনুবাদ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিদেশী রচনা-সমূহের এ দেশীয় ভাষায় অনুবাদের একটা আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

১। দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৮৮৫ শকাব্দ, প্রকাশক, নিউস্ক্রিপ্ট।

২। প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৮৮২ শকাব্দ, প্রকাশক—নিউস্ক্রিপ্ট।

৩। বইটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এর নামপত্রটি এইরূপ: উপকথা/শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক/অনুবাদিত।/কলিকাতা/২১১নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে/শ্রীকার্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।/মূল্য ৵০ দুই আনা।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটির পরিপূরক 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' এই উদ্দেশ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র 'সখা' বা 'মুকুল' সম্পাদনাকালেই শিবনাথ শিশু সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা নয়। এর বহুপূর্বে শিবনাথ যখন 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনা করছিলেন, তখন থেকেই তিনি এ সম্পর্কে চিন্তা করতেন। 'বর্তমান সময়ে শিশুদিগের পাঠোপযোগী বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় শোচনীয় অবস্থা। তাহাদের শিক্ষোপযোগী গ্রন্থও নাই এবং শিক্ষোপযোগী প্রণালীও নাই।··· এক পার্শ্বে কতকগুলি নীরস ও আকর্ষণবিহীন পাঠ্যবিষয় অপর পার্শ্বে শিক্ষকদের ভ্রূকুটি ও বেত্রাঘাত উহার মধ্যে নির্বাক শিশুরা ভীত ও বিরক্ত হইয়া দিনপাত করে।···বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুস্তক একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পৃষ্ঠে অর্পিত হয়। আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি এরূপ ভার লইলে মনুষ্য গর্দভ না হইয়া থাকিতে পারে না।···শিশুদিগের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। সেই সেই সময়ে তদুপযুক্ত বিষয়গুলি তাহাদের সমক্ষে ধারণ করা উচিত, তাহা হইলে তাহাদের পড়িতে আনন্দ হয় এবং পাঠ করিয়া উপকারও লাভ করে।'

'···শিশুদিগকে শিক্ষা দেবার সময় দুইটী কথা স্মরণ রাখা উচিত, (১ম) পাঠ্য বিষয়গুলি যেন তাহাদের আমোদজনক হয় (২য়) সেগুলি পঠিত হইয়া যেন তাহাদের মনোবৃত্তির বিকাশের সাহায্য করে।···দেখা যায় বাল্যকালে কল্পনাশক্তি প্রবল থাকাতে শিশুরা উপন্যাস ও আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতে ভালবাসে ; সুতরাং সে সময়ে গল্পের আকারে ইতিহাসের স্থূল স্থূল বর্ণনা, বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের স্থূল স্থূল ঘটনা অতি অল্প আয়াসেই তাহাদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারা যায় এবং সেই আকারে তাহাদিগকে ধর্মনীতি বিষয়েও শিক্ষা দিতে পারা যায়।'[১]

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ ; কিন্তু এটি শিশুসাহিত্য সম্পর্কে শিবনাথের চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রকাশ।

১। সোমপ্রকাশ, সম্পাদকীয় রচনা, ১২ই ফাল্গুন ১২৮০ ( ২৩.২.১৮৭৪ ), পৃঃ ২২৬-২৮।

# তৃতীয় অধ্যায়

## প্রবন্ধ-কথা

শিবনাথের রচিত এই সব গদ্য-প্রবন্ধগুলির সাহিত্যমূল্য কতখানি, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠতে পারে। প্রথমতঃ, মনে হয়, তাঁর লেখাগুলি essay-জাতীয় রচনা নয়। কারণ এদের মধ্যে সৃষ্টিকর্মের কোন চিহ্ন নেই। তাঁর কোন প্রবন্ধেই বক্তব্য অপ্রধান নয়, কোথাও বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কোন সজ্ঞান প্রয়াস নেই। Essay-এর মধ্যে যে ব্যক্তিগত উপাদান বা egoistical elements প্রধান হয়ে ওঠে, তাঁর গদ্য-প্রবন্ধে তা কোথাও মুখ্য হয়ে ওঠে নি। ইংরেজিতে যে জাতীয় লেখাকে treatise বা discourse বা dissertation বলে শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ সে জাতীয় রচনা। মনে রাখতে হবে, সাহিত্যের দিক থেকে essay-জাতীয় লেখার মূল্য treatise বা discourse বা dissertation জাতীয় লেখার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। সেকারণে essay-জাতীয় রচনার যতটুকু সাহিত্যমূল্য প্রাপ্য, শিবনাথের প্রবন্ধগুলি তার দাবী করতে পারে না।

সুতরাং treatise ( প্রবন্ধ ) জাতীয় রচনা হিসাবে শিবনাথের গদ্যলেখা-গুলিকে বিচার করতে হবে। প্রবন্ধ কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে প্রকৃষ্ট বন্ধন। একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে যদি লেখক তাঁর বক্তব্যের বিভিন্ন উপাদান ও অংশকে অন্বিত ও সুসংবদ্ধ করে নৈয়ায়িক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছতে পারেন, তবেই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের উদ্ভব ঘটে। 'তথ্যপ্রমাণের যথাযথ সমাবেশ, ভাবে, ভাষায়, চিন্তার প্রাখর্যে, সমন্বয়ে এবং পরিচ্ছন্নতায়··· প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই···প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।'[১] উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখক তাঁর মতবাদের যৌগিকতায়, চিন্তার পরিচ্ছন্নতায়, যুক্তি-তর্কের সুচিন্তিত প্রয়োগে ও বিষয়-বিশ্লেষণের সহজাত শক্তিতে পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করে থাকেন। আমাদের বিচার করে দেখা দরকার, শিবনাথের গদ্য-প্রবন্ধগুলি এইসব দিক থেকে কতটা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

শিবনাথের প্রবন্ধগুলির উপলক্ষ্য যেমন এক নয়, তেমনি তাঁর রচনাভঙ্গিও

১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত. বাংলা সাহিত্যের একদিক ( প্রথম সংস্করণ ) পৃঃ ২৬।

এক নয়। তাঁর গদ্যলেখাগুলিকে রচনাশৈলীর দিক থেকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) উপদেশ, ব্যাখ্যান ও বক্তৃতামূলক প্রস্তাব ;

(২) সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত ছোট প্রবন্ধ ;

(৩) বিচার-বিশ্লেষণমূলক বড প্রবন্ধ ;

(৪) বিস্তৃত চিন্তামূলক আলোচনা গ্রন্থ।

এদের মধ্যে প্রথম জাতীয় রচনায় শিবনাথ স্পষ্টতঃই রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণের ধারা-রক্ষী। তাঁর পূর্বসূরীরা যেমন তাঁদের চিন্তালব্ধ বা উপলব্ধ সত্যকে সহজভাবে নিজের ভঙ্গিতে উপদেশ ও ব্যাখ্যানে ব্যক্ত করেছেন, তেমনি শিবনাথও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বা মাঘোৎসবে প্রদত্ত উপদেশাবলীতে নিজের ধর্মচিন্তা ও ঈশ্বর-উপলব্ধিকে সহজ ও সরল ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মত তাঁর উপদেশ ও ব্যাখ্যান নিছক 'শাস্ত্রের বুলি' বা 'ধর্মের কচকচিতে' পর্যবসিত হয় নি, উপলব্ধির গভীরতায়, বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ও প্রকাশভঙ্গির অকপটতায় তা শিবনাথের আপন মনের কথা হয়ে উঠেছে। এই রচনাগুলির সঙ্গে শিবনাথের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগ পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়। লেখাগুলির মধ্যে আমরা শাস্ত্রবিদ্ এবং ধর্মের ধারক ও বাহক শিবনাথকে যতখানি পাই, তার চেয়ে বেশি করে পাই তাঁর ধ্যাননিমগ্ন, রসোদ্বেল ও অনুভূতিস্পন্দিত হৃদয়টিকে। বলা বাহুল্য শিবনাথের হৃদয়-সংবাদ লেখাগুলির মধ্যে যতখানি পরিমাণে অভিব্যক্ত হয়েছে, ততখানি পরিমাণেই তা সাহিত্যগুণোপেত হয়ে উঠেছে। আর শিবনাথের বক্তৃতাধর্মী রচনার লক্ষ্য সত্যের সন্ধান হলেও তাঁর ব্যাখ্যান-জাতীয় রচনার মত তার সঙ্গেও অনেকখানি অনুভূতি ও আবেগ জড়িয়ে আছে। বক্তৃতা শুধু যুক্তিনির্ভর হলে তা শ্রোতার মনে সহজে দাগ কাটে না, তাই উৎকৃষ্ট বক্তার বক্তৃতামাত্রেই আবেগ ও অনুভূতির ডানায় ভর করে শ্রোতার মনে প্রবেশ করতে চায়। বক্তার অঙ্গভঙ্গি ও স্পন্দিত কণ্ঠস্বরও তাতে সহায়তা করে থাকে। শিবনাথ বিভিন্ন উপলক্ষ্যে যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে তথ্যসমাবেশ ও যুক্তিনির্ভরতা ছাড়াও নিশ্চয় অনেকখানি আবেগ ও অনুভূতি জড়িত ছিল। কিন্তু সেই সব বক্তৃতার যে লিখিত রূপ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেচে, তার সঙ্গে শিবনাথের আবেগ-স্পন্দিত কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গি

জড়িত নেই বলে তাদের আবেদনও অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। তৎসত্ত্বেও এই জাতীয় লেখার মধ্যে তাঁর যে গভীর বিশ্বাস, অন্তর্দর্শন, সমাজ ও ধর্মচিন্তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তা আমাদের চিত্তকে অনেকটা স্পর্শ করে। এগুলির মধ্যে ভাল লেখার গুণের চেয়ে ভাল বক্তৃতার গুণগুলি আছে এবং সেদিক থেকেই এদের সাহিত্যমূল্য স্বীকার করতে হবে।

শিবনাথ যে সমস্ত ছোট ছোট প্রবন্ধ সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্তভাবে রচনা করেছেন, তাতে ব্যাখ্যান বা বক্তৃতার চেয়ে তথ্যযুক্তি বেশি এসেছে; এগুলির মধ্যে তিনি তাঁর সমাজ-চেতনা, ধর্ম-চেতনা ও ইতিহাস-চেতনাকে বেশি পরিমাণে কাজে লাগিয়েছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে লেখাগুলির মধ্যে আদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়; বক্তব্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা অন্বয়সূত্র বজায় রেখে একটা যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা আছে। অবশ্য আধুনিক দৃষ্টিতে তাঁর উপস্থাপিত যুক্তি-তর্ক, তথ্য-তত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক উপাদানগুলির মধ্যে অনেক ফাঁক ধরা পড়ে। তিনি বঙ্কিমের মত মননশীল লেখক ছিলেন না বলে সেই ফাঁকগুলিকে ভরিয়ে দেবার কোন চেষ্টাও করেন নি। এই ত্রুটি সত্ত্বেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও মতামতের সুসম্বদ্ধতার পরিচয় আছে। একটা নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে তিনি নিজের বক্তব্যকে মোটামুটি গুছিয়ে বলার কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর লিখিত 'চিন্তা সঞ্চরণ', 'বিদ্যাসাগরের জীবনী', এবং 'গৃহধর্মের' অন্তর্গত বিভিন্ন প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে।

শিবনাথের রচিত বড় প্রবন্ধগুলিতে তিনি পরিসর অনেক বেশি পেয়েছেন, বক্তব্যকে আরও গুছিয়ে বলার সুযোগ পেয়েছেন এবং স্বভাবতঃই এগুলির মধ্যে তাঁর বিষয়-বিশ্লেষণী শক্তিরও অধিকতর পরিচয় আছে। তবে কোন কোন প্রবন্ধে প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটেছে, প্রসঙ্গ থেকে তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছেন, ফলে লেখাগুলির মধ্যে দৃঢ়বদ্ধতা ও পূর্ণ নিটোলত্ব আসে নি। এ জাতীয় লেখার দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির কোন কোনটি। তাতে শিবনাথ তাঁর সাহিত্যচিন্তাকে সমাজ ও ধর্মচিন্তার সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে ফেলেছেন। তবে জাতিভেদ-বিষয়ক প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ক্রমান্বিত উপস্থাপনায় প্রাবন্ধিক শিবনাথের মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে।

শিবনাথ যে সমস্ত বিস্তৃত চিন্তামূলক আলোচনা গ্রন্থ লিখেছেন তাতে তাঁর জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, কর্ম ও ধর্ম সাধনার ফল পরিবেষিত হয়েছে। তাঁর আত্মজীবনী একটি জীবনের সূত্রে বিধৃত একটি যুগের কাহিনী, তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শিবনাথের তীক্ষ্ণ সমাজ-চেতনা ও ইতিহাসবোধ এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে স্পষ্টতঃই ফলপ্রদ হয়ে উঠেছে। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এদের গুরুত্ব অনেকখানি। 'আত্মচরিতে' বাল্য ও শৈশব-স্মৃতির বর্ণনায় শিবনাথের মনের যে ঋজুভঙ্গি ও বিশুদ্ধ রসিকতা প্রকাশ পেয়েছে, তা লেখাটির মধ্যে নিঃসন্দেহে কতকটা সাহিত্যস্বাদ এনে দিয়েছে।

প্রারম্ভেই বলেছি, শিবনাথের গদ্যগ্রন্থগুলি প্রবন্ধ-জাতীয় রচনা। ফলে রসগত মূল্যে নয়, চিন্তার মূল্যেই সেগুলি মূল্যবান্। তিনি যে কাব্যচর্চা করেছেন, কালক্রমে তার মূল্য অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে গেছে, তিনি যে সমস্ত উপন্যাস লিখেছেন, তাদের রসাবেদনও অনেকটা স্তিমিত। কারণ, সাহিত্য-শিল্পের ভাব ও রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের মূল্য হ্রাস পাওয়াও খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ-জাতীয় রচনাগুলি জ্ঞানের ভাণ্ডারের অক্ষয় সম্পদ। জ্ঞানপিপাসুদের কাছে তাদের মূল্য আরও অনেক কাল ধরে যে স্বীকৃত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃই তিনি বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে সুলেখক ছিলেন।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## সম্পাদক শিবনাথ

### প্রথম অধ্যায়

### সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা

আমরা প্রথমেই শিবনাথ-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলির একটি তালিকা প্রণয়ন করছি এবং পরে একে একে সেগুলির আলোচনা করছি।

১. মদ না গরল ?—১৮৭১।
৪. সোমপ্রকাশ—১৮৭৩-৭৪।
৩. সমদর্শী or the Liberal—১৮৭৪।
৪. সমালোচক—১৮৭৮।
৫. তত্ত্বকৌমুদী—১৮৭৮।
৬. সখা—১৮৮৫-৮৬।
৭. মুকুল—১৩০২-১৩০৭ বঙ্গাব্দ।
৮. সঞ্জীবনী—১৯০৮।

#### ১ ॥ মদ না গরল ? ॥

কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেই ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত সংস্কার সভা' ( Indian Reform Association ) নামক একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার পাঁচটি শাখার মধ্যে 'সুরাপান নিবারণী' অন্যতম শাখা ছিল। এই শাখার মুখপত্রের নাম 'মদ না গরল ?'। শিবনাথ লিখেছেন, 'আমি সুরাপান বিভাগের সভ্যরূপে 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলাম। তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধসকল বাহির হইত। সে সমুদায়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম।'[১] মিস্ এস্ ডি. কলেট লিখেছেন,[২] 'The object of this section is to

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১০৭।
২। Brahmo Year Book—1876, Pp. 49.

arrest the growth of intemperance among native population, especially among the better educated classes. A monthly Bengali journal entitled *Madh na Garal* ( Wine or Poison ) was started in April, 1871, and was largely distributed gratis. Much useful information, collected by the section, was published in this journal.' পত্রিকাটি যে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই প্রথম প্রকাশিত হয় তার অন্য একটি প্রমাণ রয়েছে ভারত সংস্কার সভার বার্ষিক বিবরণীতে—'A monthly journal in Bengali has been started for the diffusion of temperance principles, under the name of "Madh na Garal ?" (Wine or Poison ?). The first number was issued in April'.[১] পত্রিকাটির প্রকাশ অনিয়মিত ছিল। 'সোমপ্রকাশে' তার ইঙ্গিত রয়েছে—"২৭ আষাঢ়, বুধবার।—আমরা আহ্লাদিত হইলাম 'মদ না গরল' নামক পত্রিকাখানি পুনর্বার আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সুরাপান নিবারণ করাই ইহার উদ্দেশ্য।"[২] পত্রিকাটি যে কতদিন জীবিত ছিল তা নিশ্চয় করে বলতে পারি না। তবে ১২৮০ বঙ্গাব্দ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দেও যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি প্রমাণ আমরা উল্লেখ করছি।—"এত দিনের পর কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ( ১২৮০ ) মাসের 'মদ না গরল' প্রকাশিত হইয়াছে। মদ না গরল বিনামূল্যে বিতরিত হয়, সুতরাং ভিক্ষা করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। ভিক্ষাও নিয়মিতরূপে পাওয়া যায় না। সুতরাং কাগজ বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে। যদি জন্মভূমিকে সুরার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছা থাকে তবে সকলে যত্ন করিয়া মদ না গরলকে রক্ষা করুন।"[৩]

বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও এদেশে পত্রিকাটির সন্ধান পাই নি। কাজেই পত্রিকাটিতে কি ধরণের লেখা প্রকাশিত হত বা পত্রিকাটির আকারই বা কেমন ছিল, তা জানতে পারি নি। তবে অন্য একটি পত্রিকার একটি সংবাদ থেকে পরোক্ষভাবে মদ না গরলের চরিত্রের একটা আভাস পাই।—" "মদ

১। Annual Report of the Indian Reform Association, 1870-71, Pp 15.

২। সোমপ্রকাশ, ১লা শ্রাবণ ১২৭৯।

৩। সুলভ সমাচার, সংবাদসার বিভাগ, ৩০এ বৈশাখ ১২৮১ সংখ্যা, পৃ: ৫২৪।

না গরল" বলেন হাবড়ার সন্নিকট পুরাতন সায়েরে খুরুট নিবাসী এক ভদ্র, ধনাঢ্য লোক আপন ভদ্রাসনের সম্মুখে একখানি মদের দোকান খুলিয়াছেন। ভদ্রলোক আগে মদ স্পর্শ করা মহা পাপ জানিতেন, এখন তাহার ব্যবসায়ও চালাইতে লাগিলেন কালে আরো কি হয় ?"[১]

বঙ্গদেশে সুরাপান নিবারণী আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'মদ না গরল' প্রথম ভূমিকা গ্রহণ করে নি। সুরাপান আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে প্রথম সুরাপাননিবারণী সভা স্থাপন করেন। কিন্তু এই সভার কোন মুখপত্র ছিল না। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার যে মাদকনিবারণী সভা স্থাপন করেন, তার মুখপত্র হিসাবে 'হিতসাধক'[২] এবং 'Well Wisher' নামে দুটি পত্রিকা যথাক্রমে বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় স্বয়ং প্যারীচরণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কেশবচন্দ্র সেন এই সভার সভ্য ছিলেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী প্যারীচরণের প্রভাবেই মদ্যপান-বিরোধী হয়ে ওঠেন।[৩] প্যারীচরণের আন্দোলন ও 'হিতসাধকের' অনুসরণ করেই 'মদ না গরলের' প্রকাশ।

এই পত্রিকার মাধ্যমে যে আন্দোলন চালানো হয়েছিল, তার পরিণামে এবং কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে বড়লাটের নিকট প্রেরিত আবেদনের ফলে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকার কয়েকটি বিধি প্রবর্তন করেন। সেদিক থেকে শিবনাথের কৃতিত্ব কম নয়।

'মদ না গরল'-এর প্রভাব অন্যত্রও দেখা গেছে। এই পত্রিকার আন্দোলনেই কেশবচন্দ্রকে 'আশাবাহিনী' বা 'ব্যাণ্ড অফ্ হোপ' দল গঠনে প্রেরণা দিয়েছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না।[৪]

এই পত্রিকাতেই পত্রিকা সম্পাদনের ব্যাপারে শিবনাথের হাতে খড়ি হয়। 'মদ না গরল'-এর প্রচার এবং আন্দোলনের ফল দেখে মনে হয় সম্পাদক হিসাবে চব্বিশ বছরের এই যুবকটি যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

১। ভারত সংস্কারক, ৭ই অগ্রহায়ণ ১২৫০, পৃঃ ৩৭০।
২। প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮।
৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৫৬।
৪। প্রবাসী, (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়), অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, পৃঃ ৩০৪।

## ২ । সোমপ্রকাশ ॥

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের এক অক্ষয় কীর্তি। এই পত্রিকাটি প্রকাশের যখন পরিকল্পনা হয়, তখন থেকেই শিবনাথ এর কথা শুনে এসেছেন। সংস্কৃত কলেজে শিবনাথ যখন পড়তেন, সে সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারকানাথের সঙ্গে 'সোমপ্রকাশের' প্রকাশনা ব্যাপারে পরামর্শাদি করতেন। যাই হোক, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে শেষের দিকে দ্বারকানাথ বাবু পরিবর্তনের জন্য কাশী যেতে মনস্থ করেন। কাশী যাওয়ার পূর্বে তিনি ভাগিনেয় শিবনাথকে 'সোমপ্রকাশ' সম্পদনার ভার দিয়ে যান। শিবনাথ লিখেছেন, 'আমি মাতুলের সাহায্যের জন্য হরিনাভিতে গেলাম। গিয়া মাতুলের 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদক·· হইয়া বসিলাম। বড়মামা আমাকে বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীতে গেলেন।·· সোমপ্রকাশের কার্যভার প্রধানত আমার উপর পড়িয়া যাওয়াতে সংবাদপত্রাদি পাঠে ও লেখাতে অনেক সময় দেওয়া আবশ্যক হইল।'[১]

শিবনাথ ঠিক কোন সংখ্যা থেকে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন 'সোমপ্রকাশে' তার উল্লেখ নেই। অথচ পূর্বে অন্য একটি উপলক্ষ্যে দ্বারকানাথ যখন সম্পাদকের কর্মভার মোহনলাল বিদ্যাবাগীশকে অর্পণ করেন, তখন 'সম্পাদককৃত বিজ্ঞাপনে' তার উল্লেখ করেছিলেন।[২] কয়েকটি পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা আমরা শিবনাথের ভার গ্রহণের তারিখ নির্ণয় করার চেষ্টা করছি। তাতে সম্পাদক হিসাবে শিবনাথের কৃতিত্ব নির্ণয়ের সুবিধা হবে।

১লা পৌষ ১২৮০ সংখ্যা পর্যন্ত 'সোমপ্রকাশে'র বিজ্ঞাপনে ( পৃঃ ৬০ ) গ্রাহকবর্গকে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু ১লা পৌষ ও পরবর্তী ৮ই পৌষ ১২৮০ সংখ্যা থেকে পর পর কয়েকটি সংখ্যায় কেদারনাথ চক্রবর্তীর নামে টাকা পাঠাবার কথা বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

'গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১১৮।
২। সোমপ্রকাশ, ৫ই জুন ১৮৬৫ সংখ্যা।

মূল্য মণি অর্ডারে পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্তীর নামে রেজীষ্টারি করিয়া পাঠাইয়া দেন। —অধ্যক্ষস্য।'[১]

কাজেই অনুমান করি শিবনাথ সম্ভবত: এই সংখ্যা থেকেই ( ১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৩ ) সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ; যদিও এই সংখ্যার সম্পাদকীয় দ্বারকানাথেরই রচনা বলে মনে হয়। কারণ সম্পাদকীয়টি ছিল পূর্ববর্তী ৪র্থ সংখ্যার অনুবৃত্তিমাত্র। পরবর্তী ৬ষ্ঠ সংখ্যার ( ৮ই পৌষ ) সম্পাদকীয় স্তম্ভের বিষয়বস্তু ভিন্নতর ছিল—'ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' নামক ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত একটি নূতন সভার কথা, যেখানে প্রসঙ্গক্রমে মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের কথা আলোচিত হয়েছে।

শিবনাথ মাত্র সাত মাস 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনা করেন। ৫ই শ্রাবণ ১২৮২ ( ২০ এ জুলাই ১৮৭৪ ) সংখ্যা পর্যন্ত সোমপ্রকাশের 'নিয়মাবলী'তে টাকাকড়ি-চিঠিপত্র কেদারনাথ চক্রবর্তীর নামে পাঠানোর অনুরোধ বিজ্ঞাপিত হয়েছে। কিন্তু ১৯ এ শ্রাবণ ১২৮১ ( ৩রা আগষ্ট ১৮৭৪ ) সংখ্যায় দ্বারকানাথের নামেই টাকা পাঠাতে বলা হয়েছে। ১২ই শ্রাবণ ১২৮১ ( ২৭.৭.১৮৭৪ ) তারিখে 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছে, 'আমরা অনেকদিন বিদেশে ছিলাম, সম্প্রতি দেশে আসিয়া নিজ গ্রাম ও সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া দু:খিত হইলাম।' 'ভারত সংস্কারক'ও ২রা শ্রাবণ ১২৮১ তারিখে দ্বারকানাথের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানিয়েছে। সুতরাং শিবনাথ ৫ই শ্রাবণ ( ২০.৭.১৮৭৪ ) সংখ্যা পর্যন্ত 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনা করেছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একথা লিখেছেন।[২]

'সোমপ্রকাশে'র খ্যাতি ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য এই সাত মাস শিবনাথকে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কলকাতায় শিক্ষকতা ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। শিবনাথ লিখেছেন, 'আমি শনিবার হরিনাভিতে যাইতাম, রবিবার সোমপ্রকাশ সম্পাদনা করিতাম, সোমবারে ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিতাম।' কাগজটির উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে তাঁর চেষ্টার কথা উল্লেখ

১। 'সোমপ্রকাশ', বিজ্ঞাপন, ১লা পৌষ ১২৮০, পৃ: ৬১।

২। 'পরবর্তী ২৭এ জুলাই হইতে বিদ্যাভূষণ পুনরায় সম্পাদনভার গ্রহণ করেন'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র ( ১৩৫৪ ), পৃ: ১৫৮।

করে শিবনাথ আরও লিখেছেন, 'অবশেষে আমি আমার কাজের সুবিধার জন্য মাতুলের কাগজ ও ছাপাখানা ভবানীপুরে তুলিয়া আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক ফরমা ইংরাজী সংযোগ করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রেসেরও অনেক উন্নতি করিলাম।'[১] অবশ্য এই ইংরেজি অংশ সংযোগের জন্য কাগজের অবনতি ঘটেছিল, এমন অভিযোগও শোনা যায়।[২]

পত্রিকাটি সম্পাদনা ছাড়াও সোমপ্রকাশের রিপোর্টার হিসাবে শিবনাথ মাঝে মাঝে কাজ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'স্মরণ আছে যে সোমপ্রকাশের প্রতিনিধিরূপে হরিনাভি হইতে অভিনয় দেখিতে কলিকাতায় আসিতাম।'[৩]

শিবনাথের সম্পাদনাকালেও সোমপ্রকাশের নির্ভীক স্বভাব যে অক্ষুণ্ণ ছিল তা পত্রিকাটির সম্পাদকীয় স্তম্ভ ও অন্যত্র প্রকাশিত লেখাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। হরিনাভি, রাজপুর ইত্যাদি স্থানের প্রতি তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটির অমনোযোগ দেখে পূর্ব থেকেই দ্বারকানাথ এই সকল স্থানের উন্নতির জন্য সোমপ্রকাশে আন্দোলন করে আসছিলেন। শিবনাথ এই আন্দোলনকে আরও বেগবান্ করে তুললেন। দ্বারকানাথ···'তৎকালীন হরিনাভি বিদ্যালয়ের শিক্ষক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের সাহায্যে এদেশে একটি স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। সোমপ্রকাশের জলন্ত ভাষা এবং বিদ্যাভূষণের ক্রমাগত চেষ্টার গুণে'[৪] রাজপুরে একটি স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। এ ব্যাপারে স্বীয় উদ্যোগের তথ্য শিবনাথ তাঁর 'আত্মচরিতে' উল্লেখ করেছেন।[৫] ৮ই পৌষ ও ২২এ পৌষ ১২৮০ সংখ্যার 'সোমপ্রকাশে' এই জলন্ত ভাষার প্রমাণ মিলবে। নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রবন্ধেও এই সাহসিকতার পরিচয় রয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সিবিল সার্ব্বিস হইতে বহিষ্কৃত' হলে শিবনাথ ইংরেজ সরকারকে তীব্র ভাষায় অভিযুক্ত করেছিলেন।[৬] 'ইংরাজী শিক্ষায়

---

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১২৪।
২। হরমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক (১ম ভাগ), পৃঃ ৯৯৬।
৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৯০।
৪। সোমপ্রকাশ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ১০ই ভাদ্র ১২৯০ সংখ্যা।
৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১১৯-২০।
৬। সোমপ্রকাশ, সম্পাদকীয়, ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮১।

ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকার কি হইল?'[১] নামক প্রবন্ধেও এই সাহসিকতা প্রকাশিত হয়েছে। 'চটিপায় ব্রাহ্মণ' ছদ্মনামে যে শিবনাথ বাল্যকালেই এই সোমপ্রকাশে ইংরেজ উড্রোসাহেবের বিরোধিতা করে লিখেছিলেন, 'ইংরাজী জুতায় মান থাকে আর চটি জুতায় মান যায় একথা আমি·· সাহেবের মুখেই শুনিলাম', তার পক্ষে এ ধরণের প্রতিবাদ রচনা অস্বাভাবিক ছিল না। আর এই সৎ-প্রতিবাদই ছিল সোমপ্রকাশের বৈশিষ্ট্য।[২] 'আদালতে উৎকোচ গ্রহণের প্রতিবাদ'ও এই প্রকারের একটি রচনা।[৩]

'মদ না গরল' সম্পাদনা করলেও সোমপ্রকাশেই শিবনাথের সাংবাদিকতায় যথার্থ শিক্ষানবীশী শুরু হয়। একদা যে পত্রের তিনি লেখক মাত্র ছিলেন—সেই পত্রেরই তিনি যোগ্য সম্পাদক হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, শিবনাথের সাহিত্য ও সাংবাদিক জীবনে দ্বারকানাথের প্রভাব ছিল প্রভূত। বিপিনচন্দ্র পাল যথার্থই মন্তব্য করেছেন, '*Somprakash* was, however a professedly political newspaper, and it had always been absolutely outspoken in its criticism of Public policies and measures. And Shivanath had been trained by his uncle as a Bengali writer. ...Vidyabhushan exerted very considerable influence in the making of Shivanath's mind and character.'[৪]

### ৩ ॥ সমদর্শী ॥

'সোমপ্রকাশে' শিক্ষানবীশী শিবনাথকে স্বাধীনভাবে সাময়িকপত্র সম্পাদনের ব্যাপারে উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছিল। 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনার জন্য শিবনাথ যখন হরিনাভিতে বাস করছিলেন (১৮৭৪), সে সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একটি নূতন বিবাদের সূচনা হয়েছিল। 'মহাপুরুষবাদ' ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে পূর্ব থেকেই একটা কেশব-বিরোধী গোষ্ঠী ছিল। কিন্তু

১। তদেব, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮১।

২। রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (৫ম সং ১৩৫৯) পৃঃ ৩০৫-৬।

৩। সোমপ্রকাশ, ২রা আষাঢ় ১২৮১।

৪। Bipin Chandra Pal, Memoirs of My Life and Times (1939) Pp. 306-7

এবারে কেশবচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা প্রচার করলেন যে, যেহেতু প্রচারকগণ ঈশ্বর-নিযুক্ত, সুতরাং তাঁদের কার্যের বিচার মানুষে করতে পারবে না। ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুবকগণ চেষ্টা করছিলেন, এই প্রচারে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে একটি ভিন্ন দল গঠন করেন। এই দলের নাম 'সমদর্শী' দল। এই দলের মুখপত্র হিসাবে 'সমদর্শী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা শিবনাথের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। অর্থাৎ 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকত্ব ত্যাগের চার মাসের মধ্যেই। পত্রিকাটি ছিল দ্বিভাষিক, অর্থাৎ বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশিত হত। এ সম্পর্কে 'সমদর্শী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়[১] লেখা হয়েছে যে, 'The Journal will be conducted in English and Bengali, that it may be accepted to the theists of other Presidencies. In short the projectors aspire to make it, what it should be, an *impartial Exponent of Theistic opinion.*

শিবনাথ লিখেছেন, 'সমদর্শীতে আমরা কেশববাবুর কোনো কোনো মতের প্রতিবাদ করিতাম ও স্বাধীনভাবে ধর্ম তত্ত্বের আলোচনা করিতাম।'[২] কেশবচন্দ্রের সমর্থকগণের প্রতিবাদ রবিবাসরীয় মিরারে প্রকাশিত হত। অর্থাৎ স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, ধর্মীয় বাদানুবাদই এই পত্রিকা প্রচারে প্রেরণা দিয়েছিল। সেকারণেই পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধেই তৎকালীন ব্রাহ্মধর্মের বিবাদের নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। আবার ব্রাহ্মধর্ম প্রধানতঃ সমাজ সংস্কারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল বলে তৎকালীন সামাজিক আন্দোলন, যথা—ব্রাহ্মবিবাহ ও ১৮৭২ সালের তিন আইন ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গও 'সমদর্শী'র পৃষ্ঠায় আলোচিত হত।

কেশবচন্দ্রের বিরোধিতা পত্রিকাটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও সম্পাদক নিজে ব্যক্তিগতভাবে কেশবচন্দ্রকে কখনই অশ্রদ্ধা করতেন না। 'সমদর্শী'র পৃষ্ঠাতেই এই 'সমদর্শিতার' প্রমাণ রয়েছে—'ব্রাহ্মদিগের মিতাচার, ব্রাহ্মদিগের উৎসাহ, ব্রাহ্মদিগের সচ্চরিত্রতা, অনুসন্ধান করিলে ইহার অধিকাংশেরই মূলে বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে দেখিতে পাই। ব্রাহ্মসমাজের

১। সমদর্শী, ১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১২৮১, Nov. 1874
২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১২৬-২৭।

সৌভাগ্যের বিষয় যে ইহার শৈশবাবস্থায় তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির হস্তে নেতৃত্বভার পড়িয়াছে।'

তবুও সাম্প্রদায়িকতাকে লেখক অস্বীকার করেন নি। বলেছেন, 'As long there is freedom of thought and freedom of discussion so long there must be division into *parties, sects, cliques* or whatever other names we may give them. No class of opinions, religious, social, moral or political, forms an exception of this.[১] আবার পরমতসহিষ্ণুতারও প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন। পত্রিকাটি প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্যও যে তাই, সেকথা পত্রিকার এক স্থানে লিখিত হয়েছে—'this journal is an humble attempt in that direction'[১ক] 'সমদর্শীর এই বিশিষ্ট চরিত্রের কথা উল্লেখ করে সম্পাদক আরও লিখেছেন, 'ব্রাহ্মসমাজে মত বিষয়ক স্বাধীনতা ও উদারতার উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যেই সমদর্শীর সৃষ্টি। ইহাতে পরস্পরের বিরুদ্ধে যাহার যাহা বলিবার আছে, বলিব এবং শুনিব, আবার পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিতে ত্রুটিবোধ করিব না। শ্রদ্ধার সহিত পরস্পরের প্রতিবাদ দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া আনন্দিত হওয়াই উচিত। এইজন্যই সমদর্শীতে পরস্পরবিরুদ্ধ মত সকল স্থান পাইতেছে।' এখানেই 'সমদর্শী' নামের সার্থকতা। অবশ্য এই নামটি নিয়ে সে সময়ে রহস্যও কম হয় নি। 'কোন রহস্যপ্রিয় সম্পাদক এই পত্রের সমালোচনায় বলিয়াছেন, ইনি সমদর্শী অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের স্থাবর ও জঙ্গম উভয় দলকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।'[২]

প্রধানতঃ ধর্মসমালোচনামূলক ও একটি বিশেষ দলের মুখপত্র ছিল বলে "সমদর্শী' খুব বেশি পরিমাণে লেখক সংগ্রহে সমর্থ হয় নি। আমরা মোট সতেরো জন লেখকের নাম পেয়েছি। এঁরা প্রায় সকলেই 'সমদর্শী' দলভুক্ত। আদি ব্রাহ্মসমাজের রাজনারায়ণ বসুর একটি ইংরেজি রচনার সংকলনও এই পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। শিবনাথ ব্যতীত অন্য লেখকদের মধ্যে রয়েছেন, শিবচন্দ্র দেব, মথুরানাথ বর্মণ, বঙ্গচন্দ্র রায়, যদুনাথ চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, পদ্মহাস গোস্বামী, নবীনচন্দ্র

১। ১ক। সমদর্শী, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৮১।

২। শ্রীনাথ চন্দ, ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর, পৃঃ ১৫০, পাদটীকা।

রায়, চন্দ্রশেখর বসু, শিতিকণ্ঠ মল্লিক, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এবং কেদারনাথ কুলভী।

শিবনাথ ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী) ছিলেন 'সমদর্শী'র প্রধান লেখক।' পত্রিকাটিতে তাঁর বাংলা ও ইংরেজি রচনার সংখ্যা মোট ৬৩। শিবনাথ 'শি. না ভ' এবং 'শ্রীশিঃ'—এই দুই সংক্ষিপ্ত নামেও লিখেছেন। সমদর্শীর ধর্মবিবাদহীন কবিতাগুলি সবই শিবনাথের রচনা।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪ সংখ্যায় 'ব' ও 'য' সংক্ষিপ্ত নামে প্রকাশিত রচনাদ্বয় যথাক্রমে বঙ্গচন্দ্র রায় ও যদুনাথ চক্রবর্তীর লেখা বলে অনুমান করি।

লেখক নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পাদক শিবনাথের একটা বিশেষ ধারণা ছিল। তাঁর মতে ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে বিশ্বাসী একেশ্বর-বাদী মাত্রেই 'সমদর্শী'র লেখক হিসাবে গণ্য হবার অধিকারী ছিলেন।— 'Here are welcome conservatives and progressives, professed Brahmos and theists who have not formally joined the Brahmo Samaj,—in short whoever accepts the short and simple creed of theism as his faith, and thereby seeks the moral and spiritual elevation of India.' পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা ব্যতীত পরে আরও একবার এই আহ্বান অন্যত্র বিজ্ঞাপিত হয়েছিল 'ইহাতে একেশ্বরবাদী মাত্রেরই লিখিবার অধিকার। এমন কি সম্পাদকের মত সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রাধান্য থাকিবে না।'[১]

তবে লেখাগুলি সম্পর্কে সম্পাদকের একটা শর্ত ছিল—'Every sensible article whether religious, social and moral, will be cordially accepted, provided it is written in a good and charitable spirit.…The Editor will not hold himself responsible for the opinions expressed in the articles, and every article will bear the name of its author.' সম্পাদক আরও চেয়েছেন লেখাগুলি এমন হবে, যার মধ্যে সত্যানুসন্ধান তো থাকবেই, আরও থাকবে 'the practical good of humanity'-র চিন্তা। সম্পাদক লেখকদের এ সম্পর্কে সতর্ক করে

১। ভারত সংস্কারক, সমদর্শীর বিজ্ঞাপন, ১৮ই পৌষ ১২৮১, পৃঃ ৪৩২।

দিয়ে লিখেছেন 'We request our contributors to have their eyes fixed on this, when they write articles for this journal'[১]

এমন ধরণের লেখা যে এই পত্রে নেই তা নয়। তবে ধর্মকলহবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। ফলে পত্রিকাটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলেও লেখকগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তত ফুটে ওঠে নি। শিবনাথের কবিতাগুলি অবশ্য এর ব্যতিক্রম। বিপিনচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, 'যে পত্রিকা যে দলের মুখপত্র, তাহাতে সেই দলের মতামত ও রীতিনীতিরই পোষকতা করা হয়। এই সকল রচনার ভিতর দিয়া লেখকগণের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না।'[২] তা না পেলেও 'সমদর্শী'র উদ্দেশ্য অন্তত: কিছু পরিমাণে সাধিত হয়েছিল। প্রধানত: এই পত্রিকার প্রতিক্রিয়ার ফলেই 'কেশববাবুর অনুগত প্রবীণ ব্রাহ্ম দল ও যুবক ব্রাহ্ম দলের মধ্যে চিন্তা ও ভাবগত বিচ্ছেদ দিন-দিন'[৩] বেড়ে গেছিল। যার শেষ পরিণতি ঘটেছিল ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বিচ্ছেদে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায়। ধর্ম ব্যাপারে 'সমদর্শী'র ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র লিখেছেন, 'ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসিদ্ধান্ত ও ধর্মসাধনাকে সর্বপ্রকারের অতি প্রাকৃতত্ব ও অতি লৌকিকত্ব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর সম্পাদিত 'সমদর্শী' যতটা চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর কোথাও সেরূপ চেষ্টা করা হয় নাই।'[৪] সুদূর মফ:স্বলেও এই ভাব বিস্তারিত হয়েছিল। '·· সমদর্শী পত্রে এই সকল চিন্তা ও মতবৈষম্য প্রকাশ পাইতেছিল ; মফ:স্বলেও সেই সকল ভাব সংক্রামিত হইতেছিল'।[৫]

'ধর্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক' এই মাসিক পত্রিকাটি কোন এক অজ্ঞাত কারণে কার্তিক ১২৮২ ( অক্টোবর ১৮৭৫ ) সংখ্যার পর থেকে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রথম বর্ষের বারোটি সংখ্যা ঠিকমতো প্রকাশিত হয়। সতেরো মাস বন্ধ থাকার পর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৮৪ ( এপ্রিল ১৮৭৭ ) মাসে। পর পর তিনটি সংখ্যা ( বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ,

১ সমদর্শী, মাঘ ১২৮১।
২ বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত কথা, পৃ: ১৮০।
৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ: ১৩২।
৪ বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত কথা, পৃ: ১৮০।
৫ শ্রীনাথ চন্দ্র, ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর, পৃ: ১৭০।

আষাঢ়) প্রকাশিত হওয়ার পর 'সমদর্শী'র প্রচার একেবারে রহিত হয়। এর কতকগুলি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, এ ধরণের বিবাদমূলক পত্রিকার প্রচার হয়ত শিবনাথ আর বোধ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ, পত্রিকাটি প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব একা শিবনাথকেই বহন করতে হচ্ছিল। শেষ সংখ্যার অব্যবহিত পূর্বের দুটি সংখ্যার (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪) সমস্ত রচনা শিবনাথকেই লিখতে হয়েছিল। মনে হয় এ ধরণের ধর্মীয় বিবাদে লেখকগণেরও হয়ত আর উৎসাহ ছিল না। তৃতীয়তঃ, ১৮৭৭ সালে শিবনাথ ভয়ঙ্কর রকমের অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতার জন্যও 'সমদর্শী'র প্রচার সহসা রহিত হয় বলে মনে করি।

## ৪ ॥ সমালোচক ॥

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে 'সমদর্শী'র প্রচার বন্ধ হয়ে গেলেও সমদর্শী দলটি ব্রাহ্মসমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। শিবনাথ এই দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। এই আন্দোলন আরও বেগবান্ হয়ে উঠলো বিশেষ একটি সংবাদে। ৩০এ জানুয়ারী তারিখে শিবনাথ তাঁর ডায়েরীতে এই নূতন সংবাদের উল্লেখ করে লিখেছেন, 'ইতিমধ্যে বাবু লোকনাথ মৈত্র এক নূতন সংবাদ লইয়া আসিলেন। কুচবিহারের রাজার সহিত কেশববাবুর কন্যার শীঘ্র বিবাহ হইতেছে। কমিশনার সাহেব নাকি আগামী ৬ই মার্চ বিবাহ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন।·· আগামী মার্চ মাসে বিবাহ হইলে বড় পুঁটীর বয়স চৌদ্দও সম্পূর্ণ হইবে না।'[১] কুচবিহারের মহারাজাও তখন ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে অপ্রাপ্তবয়স্ক। 'সমদর্শী' দল এই প্রকারের বিবাহের বিরোধিতা করার জন্য একটি বাংলা ও আর একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করলেন। শিবনাথ লিখেছেন, 'এদিকে আমরা আন্দোলন চালাইবার জন্য ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে 'সমালোচক' নামে এক-বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ ও ২১শে মার্চ হইতে ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন নামক এক ইংরাজি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিলাম। দুর্গামোহনবাবু ও আনন্দমোহনবাবু উক্ত উভয় কাগজের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।···আমি বাংলা কাগজের

১। হেমলতা দেবী কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্রঃ, শিবনাথ-জীবনী, পৃঃ ১৫৭।

সম্পাদক হইলাম। তাহাতে চারিদিকের ব্রাহ্মগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল।'[১] ৬ই মার্চ বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষাধিক কাল পূর্বে 'সমালোচকের' আবির্ভাব।

'আত্মচরিত' থেকে জানতে পেরেছি পত্রিকাটি প্রথম ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে ব্রাহ্ম ইয়ার বুকেও দেখছি যে, "The Kuch-Behar marriage agitation soon gave rise to the issue of other periodicals. The "Samalochak" (or "Review") now a secular weekly, was s'arted on February 17.'[২] কিন্তু এই ব্রাহ্ম ইয়ার বুকেই আবার লক্ষ্য করছি (পৃঃ ১৫) যে, প্রথম সংখ্যাটি ১৬ই ফেব্রুয়ারি (৫ই ফাল্গুন) এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি ২৩এ ফেব্রুয়ারি (১২ই ফাল্গুন) তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। এ থেকে মনে হয়, পত্রিকাটি ১৬ তারিখে মুদ্রিত হয়ে ১৭ তারিখে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটি প্রকাশের কোন তারিখ উল্লেখ করেন নি)।

বহু অনুসন্ধানেও এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির কোন সংখ্যা দেখতে সমর্থ হই নি। তাই পরোক্ষ উক্তির সাহায্যে পত্রিকাটির চরিত্র নির্ণয় করার চেষ্টা করছি। 'সমদর্শী' পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল কেশবচন্দ্রের 'অগণতান্ত্রিক' মনোভাব ও 'মহাপুরুষবাদের' সমালোচনা করা। তাছাড়া অন্যবিধ ধর্মীয় ও মৌলিক রচনাও 'সমদর্শী'তে প্রকাশিত হত। কিন্তু 'সমালোচকের' সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য ভিন্নতর ছিল। এডুকেশন গেজেট[৩] 'সমালোচকে'র প্রথম সংখ্যা পেয়ে লিখেছেন, 'সমালোচক—সাপ্তাহিক পত্রিকা, মূল্য এক পয়সা। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার সহিত কোচবিহার রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া এই পত্রিকাখানির সৃষ্টি হইয়াছে।' এই প্রসঙ্গে এডুকেশন গেজেট 'সমালোচকে'র উদ্ধৃতিও দিয়েছেন :—

'পত্রখানির দুটী উদ্দেশ্য আছে, একটী মুখ্য ও অপরটী গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্যটী কেশববাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া আন্দোলন করা : গৌণ

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত. পৃঃ ১৫৬।

২। Brahmo Year Book—1878, Pp 43.

৩। এডুকেশন গেজেট, ১লা মার্চ ১৮৭৮, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্রঃ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাংলা সাহিত্য, ৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা. পৃঃ ২৫২।

উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে সাধারণের উপযোগী প্রস্তাব এবং সংবাদাদি দিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করা।'

পত্রিকাটির মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিবনাথ কুচবিহারস্থ প্রতিনিধি মারফৎ ভিতরের সংবাদাদি জ্ঞাত হয়ে 'সমালোচকে' 'সারস পাখির উক্তি'—এই পর্যায়ে 'ধারাবাহিক' রচনা লিখতে আরম্ভ করেন।[১]

গৌণ উদ্দেশ্যও যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সাধিত হয়েছিল, মিস্ কলেটের পত্রিকাটি সম্পর্কে মন্তব্য 'now a secular weekly' তার পরোক্ষ প্রমাণ।

শিবনাথের রচনা ব্যতীত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ও অন্য কয়েকটি সংখ্যায় অন্যান্য কয়েকজনের প্রতিবাদ পত্র মুদ্রিত হয়েছিল। একথা আমরা মিস্ কলেটের ব্রাহ্ম ইয়ার বুক থেকে জানতে পেরেছি। এ থেকে পত্রিকাটি তার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে কতখানি অগ্রসর হয়েছিল তা জানা যায়। ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় উক্ত বিবাহের সংবাদ সমর্থিত হয়েছে দেখে ঐ দিনই গুরুচরণ মহলানবিশ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কালীনাথ দত্ত—এই তিনজনে কেশববাবুর নিকটে গিয়ে শিবনাথ-রচিত একটি প্রতিবাদ পত্র দিয়ে আসেন। এই প্রতিবাদ পত্রের অনুক্রম হিসাবে আরও বহু প্রতিবাদ পত্র আসতে লাগল। 'সমালোচকে' এই প্রতিবাদগুলির কিছু কিছু প্রকাশিত হতে থাকে।

পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় ( ১৬. ২. ১৮৭৮ ) প্রায় কুড়িজন ব্রাহ্মিকা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিবাহের সংবাদে বিস্মিত ব্রাহ্মিকাগণ কেশবচন্দ্রকে লিখেছেন ( কুমারী কলেট কর্তৃক ভাষান্তরিত ), "We could not even have imagined that any act of yours would ever be obstacle to female education, or injurious to women ; we are therefore exceedingly grieved at this unexpected act.[২] দ্বিতীয় সংখ্যায় ( ২৩. ২. ১৮৭৮ ) হরগোপাল সরকার মহাশয়ের একটি ব্যক্তিগত প্রতিবাদ পত্র এবং ডাঃ প্রসন্ন কুমার রায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রমুখ ঢাকার আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদের ১২ জনের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্রটিও মুদ্রিত হয়েছিল। ৬ই মার্চ ( ২৩এ ফাল্গুন ) তারিখে সমালোচকের সম্ভবতঃ একটি

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৪৭।

২। Brahmo Year Book for 1878, Pp 15.

বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল (অথবা সাপ্তাহিক ক্রম অনুসারে প্রকাশিতব্য ১লা মার্চের সংখ্যাটি বিলম্বে প্রকাশিত হয়েছিল)। এই সংখ্যায় (৬ই মার্চ ১৮৭৮, ২৩এ ফাল্গুন ১২৮৪) গিরিজাসুন্দরী সেন, রাজলক্ষ্মী সেন প্রমুখ বিক্রমপুরের ব্রাহ্মিকাদের কয়েকজনের স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত আনন্দমোহন বসুর লেখা প্রতিবাদ পত্রটি উল্লেখযোগ্য।[১] এ থেকে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকল স্তরই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা অবশ্য স্মরণীয়। 'সমালোচক' সম্পাদনা-কালেই শিবনাথের চাকুরী জীবনের সমাপ্তি ঘটে। অনেকদিন থেকেই চাকুরীত্যাগের কথা তিনি ভাবছিলেন। কিন্তু এ সময়েই তাঁর স্বাধীনতাবোধ এত উগ্র হয়ে ওঠে যে প্রচুর অর্থের লোভ ত্যাগ করে তিনি ১লা মার্চ ১৮৭৮ তারিখে কাজে ইস্তফা দেন।

শিবনাথ কতদিন 'সমালোচক' সম্পাদনা করেছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। অবশ্য তিনি যে অধিক দিন এর সম্পাদক ছিলেন না, সে কথার উল্লেখ করে শিবনাথ নিজেই লিখেছেন, 'এদিকে আমি বড় নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে সমালোচক তুলিয়া লইয়া দ্বারিবাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।'[২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন যে শিবনাথ 'সমালোচকের' প্রথম দুই বা তিন সংখ্যা সম্পাদনা করেন।[৩] ১৮৭৮ সালের ব্রাহ্ম ইয়ার বুকে (পৃঃ ৯১) 'Periodicals Under Brahmo Management'-এর তালিকায় 'সমালোচক'কে 'Weekly General Newspaper' শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে এবং সম্পাদক হিসাবে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ব্রাহ্ম ইয়ার বুকেও ঐ একই প্রকার মন্তব্য দেখি (পৃঃ ১০০) ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের তালিকায় 'সমালোচকে'র কোন উল্লেখ দেখি না। এ থেকে মনে হয় যে, ১৮৭৯ সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হলেও খুব বেশি দিন চলে নি।

১। Ibid, Pp 16-17
২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৬৭।
৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৪।

'সমালোচক' যে বেশিদিন চলে নি তার মুখ্য কারণ, ইতিমধ্যে কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন থিতিয়ে এসেছিল ; আর গৌণ কারণ হল, চড়া সুরে বাঁধা তারে বেশিদিন সুর বাজে না। শিবনাথও পরে 'সমালোচকে'র প্রকাশ ভঙ্গিতে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কাজেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর 'তাহাকে··(সমালোচককে) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র করা উচিত বোধ হইল না।'

যাই হোক্‌, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ও যা তাঁর কাছে অন্যায় বলে মনে হত, তার প্রতিবাদে শিবনাথের স্বরূপ এই পত্রিকাটির মাধ্যমে কিছুটা প্রকাশিত হতে পেরেছিল মনে করি।

৫ । তত্ত্বকৌমুদী

কুচবিহার বিবাহানুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজের সংঘাতময় ক্ষেত্রে যে নবতর দ্বন্দ্বের বীজ উপ্ত করেছিল, তার প্রত্যেক ফল দেখা দিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায়। এই নূতন সমাজের একটি মুখপত্রের প্রয়োজন হল তাঁদের আপন বক্তব্যকে সাধারণ্যে প্রচারের জন্য। শিবনাথ পত্রিকাটি আবির্ভাবের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, '···আমরা নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের নামে এক নূতন কাগজ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।' নূতন কাগজের নাম কি হয় কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল 'কৌমুদী' ; আদি সমাজের কাগজের নাম 'তত্ত্ববোধিনী' ; ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কাগজের নাম 'ধর্মতত্ত্ব'। শেষোক্ত দুই কাগজ হইতে 'তত্ত্ব' এবং রাজা রামমোহন রায়ের 'কৌমুদী' লইয়া আমাদের কাগজের নাম হউক 'তত্ত্বকৌমুদী'। ১৮৭৮ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে) তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।[১] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এই ব্রাহ্ম শ্রেণী সম্প্রতি তত্ত্বকৌমুদী নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার 'তত্ত্ব' শব্দ এবং রামমোহন রায়ের প্রকাশিত কৌমুদী পত্রিকার নাম দুই একত্র করিয়া আপনাদিগের প্রকাশিত

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৫১।

পত্রিকার নামকরণ করিয়াছেন'।[১] বিপিনচন্দ্র পালও ঐ একই কথা লিখেছেন।[২]

'রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন মহাধর্মের ভাব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে', সেই ধর্মভাবের প্রচারোদ্দেশ্যেই শিবনাথ 'তত্ত্বকৌমুদী' প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মুখ্যতঃ মতভেদের কারণে সৃষ্ট বলে 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় অনিবার্যভাবে দলগত বা সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধতা ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের সমালোচনা প্রকাশিত হতে লাগল। সেকারণে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এই নবপ্রকাশিত পত্রিকাটিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে লিখেছেন, 'তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার ন্যায় পত্রিকা যতই প্রকাশিত হয় ততই আমাদিগের আহ্লাদের বিষয়,...। তিনি (সম্পাদক) কেবল ঈশ্বর ও ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মধর্মের মত প্রচার করিলে অভীষ্ট লাভ করিতে সক্ষম হইবেন সন্দেহ নাই। এবার তত্ত্বকৌমুদীতে যেমন বিবাদ বিসম্বাদের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে ভরসা করি সহযোগী সেইরূপ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে প্রকৃত তত্ত্বকৌমুদী ধর্মজগতের উপর বর্ষণ করিয়া লোকের প্রাণমন শীতল করিবেন।'[৩]

প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক কারণে আবির্ভূত হলেও তত্ত্বকৌমুদীতে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হত। আসলে ব্রাহ্মধর্মের মূল কথাই ছিল, জগতের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের একেশ্বরবাদমূলক উপদেশাদির সারগ্রহণ ও প্রচার। বাইবেল, পার্কারের 'টেন্ সারমনস্', নিউম্যান, গীতা, ভাগবত, উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে নানা উপদেশ ও আখ্যানের আলোচনা তত্ত্বকৌমুদীর বৈশিষ্ট্য ছিল। আবার ধর্মবিষয়ক নানা কবিতার (শিবনাথ এগুলির বেশির ভাগেরই রচয়িতা ছিলেন) প্রকাশ দ্বারা পত্রিকাটিকে একটা সাহিত্যিক মর্যাদা দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ যে মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে তিনটি ভিন্ন সমাজে বিভক্ত হয়ে গেছিল, তার মূল কারণ যতটা সামাজিক ও ব্যক্তিগত, ততটা ধর্মগত নয়। কাজেই স্বাভাবিক কারণেই তত্ত্বকৌমুদীতে তৎকালীন

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮০০ শক, ৪১৯ সংখ্যা, পৃঃ ৫৭-৫৮।
২। B. C. Pal, Memoirs of my Life and Times, pp 345.
৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮০০ শক, ৪১৯ সংখ্যা, পৃঃ ৫৭-৫৮।

নানা সামাজিক প্রশ্নও আলোচিত হতে লাগল। বিশেষ করে Act III of 1872—বিবাহ সম্পর্কিত এই আইনটি তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ সমূহের মুখপত্রগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। বিতর্কমূলক এই সামাজিক সমস্যাগুলি ব্যতীত নানা সামাজিক উপদেশও শিবনাথ পত্রিকাটিতে প্রকাশ করতেন।[১]

পাশ্চাত্য দর্শনসমূহের আলোচনা উনিশ শতকের মনীষীদের মুখ্য বিষয় ছিল। বিশেষ করে হিউম, কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতির দর্শনচিন্তা প্রাচ্যদেশে প্রভূত পরিমাণে চর্চা করা হচ্ছিল। 'জড়বাদ' এই প্রকার চিন্তার মধ্যে অন্যতম ছিল। তত্ত্বকৌমুদীতে এই 'জড়বাদ'[২], 'মানব প্রকৃতি'[৩] প্রভৃতি পাশ্চাত্য দর্শন সমূহেরও আলোচনা প্রকাশিত হত।

পুস্তকাদির রিভিউ প্রকাশ, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার সমালোচনা যথারীতি তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় থাকত। তবে পত্র-পত্রিকার আলোচনাগুলি দলগত কারণে কিঞ্চিৎ তিক্তরসযুক্ত থাকত। এগুলিকে পত্রিকামূলক কলহবিচার বলা যেতে পারে। বিশেষত: তত্ত্ববোধিনী ও ইণ্ডিয়ান মিরারের সঙ্গে এই প্রকারের বিচার মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছিল। তত্ত্বকৌমুদীর এই চরিত্রটি যথাযথ অনুধাবনের জন্য আমরা কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করছি। ১লা চৈত্র ১৬০০ শক সংখ্যার 'তত্ত্বকৌমুদী' কেশব-দেবেন্দ্রের সংঘাতকে 'এক-তন্ত্র-প্রণালী-প্রিয়তার' সঙ্গে 'সাধারণ-তন্ত্র-প্রণালী-প্রিয়তার' দ্বন্দ্ব বলে অভিহিত করায় 'তত্ত্ববোধিনী' তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।[৪] আবার ১৬ই বৈশাখ ১৮০১ সংখ্যার 'তত্ত্বকৌমুদী'তে ব্রাহ্মবিবাহের যে প্রতিবাদ ('সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী') প্রকাশিত হয়, আষাঢ় সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে সেই প্রতিবাদেরও প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই কলহের সূত্র ধরে আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পরিশেষে লিখেছেন, 'আমরা আমাদিগের সহযোগীকে এ পর্যন্ত অনেক কথা বলিয়াছি, তথাপি তিনি বুঝিলেন না, অতএব তাঁহাকে বুঝাইবার বিষয়ে আমদিগকে অবশেষে পরাজয় মানিতেই হইল' (পৃঃ ১০৯)। দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে এই বিবাদকে

১। এই পত্রিকায় প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ সংকলন—'গৃহধর্ম'।

২। ও ৩। যথাক্রমে 'তত্ত্বকৌমুদী'র দ্বিতীয় বর্ষের পঞ্চদশ ও ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮০১ শক, পৃঃ ১৩।

প্রশ্রয় দিয়েছিলেন বলা অসঙ্গত হবে না। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, 'বিদ্যারত্ন এবারকার পত্রিকাতেও তত্ত্বকৌমুদীকে খুব প্রহার করিয়াছেন, খুব চাবুক দিয়াছেন। তাহার আর মাথা উঠান ভার হইবেক।'[১]

এই সব কারণে বলা যেতে পারে যে, তত্ত্বকৌমুদী একটি সাধারণ সংবাদ পত্রের মত প্রচারিত হয় নি। বিপিনচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, 'তত্ত্বকৌমুদী আদি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ধর্মতত্ত্বের মত কেবল ব্রাহ্মসমাজের মতবাদই প্রচার করিত, সাধারণ সংবাদ পত্র ছিল না।'[২]

তত্ত্বকৌমুদীকে শিবনাথ আত্মজের স্নেহে লালন করে এসেছেন। কারণ এটি শিবনাথ সম্পাদিত পত্রিকা ( দ্বিতীয় পত্রিকা ), যাকে তিনি স্বাধীনভাবে সম্পাদনা করেছিলেন এবং যেটি তাঁর স্বাধীন মতামতের বাহক ছিল। 'তত্ত্বকৌমুদী'কে পত্রিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য শিবনাথ অশেষ যত্ন করেছেন। প্রথম দিকের তত্ত্বকৌমুদীর প্রতিটি রচনা শিবনাথেরই ছিল এমন মন্তব্য করা অত্যুক্তি হবে না। শিবনাথ নিজেই লিখেছেন, 'অনেকদিন এরূপ হইত, তত্ত্বকৌমুদীর প্রত্যেক পংক্তি আমাকে লিখিতে হইত। সাহায্য করিবার কাহাকেও পাইতাম না। এক এক দিন এমন হইয়াছে, দুই পত্রিকা একদিনে বাহির হইবার কথা। প্রত্যূষে স্নান ও উপাসনান্তে প্রেসে বসিয়াছি, ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের কাজ সারিয়া তত্ত্বকৌমুদীর কাজ, সে কাজ সারিয়া ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের কাজ, এইরূপ সমস্ত দিন চলিয়াছে। মধ্যে এক ঘণ্টা আহার করিয়া লইয়াছি।'[৩] মনে রাখতে হবে যে, এই পরিশ্রম-শক্তি শিবনাথ তাঁর মাতুলের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

'তত্ত্বকৌমুদী'তে লেখক সংগ্রহের ব্যাপারে শিবনাথ অনেকাংশে উদার ছিলেন। আনন্দচন্দ্র মিত্র, শশিভূষণ বসু, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের লেখা ব্যতীত তত্ত্ববোধিনী ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সারাংশাদিও তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত

---

১। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সংকলিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী', ৮৬ সংখ্যক পত্র, পৃঃ ১১৬-১৭। পত্ররচনার তারিখ—দার্জিলিং ৫ আষাঢ় ৫০ ব্রাহ্মাব্দ (—১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

২। বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৪, পৃঃ ৬০২।

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১১৪।

হত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও শিবনাথ লেখক-গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।[১]

অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের কর্মের ডাকে শিবনাথকে প্রায়ই বাইরে যেতে হত। সে সময়ে এবং শিবনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পাদক হিসাকে কাজ করেছেন। যেমন দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা থেকে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শিবনাথ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গেলে তৃতীয় বর্ষের ত্রয়োবিংশ সংখ্যা থেকে কৃষ্ণকুমার মিত্র; অষ্টম বর্ষের কার্তিক সংখ্যা থেকে সীতানাথ দত্ত; নবম বর্ষের বৈশাখ সংখ্যা থেকে আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু ব্যক্তি তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু দূরে গেলেও পত্রিকাটির প্রতি শিবনাথের তীক্ষ্ণ নজর থাকত।

শিবনাথের সাক্ষাৎ যত্নের ফলে পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা যেমন বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি আয়ও বেড়েছিল প্রচুর। তৃতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় দেখছি যে, মাত্র তিন বছরের মধ্যে পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা হয়েছিল ৪৫০। আর যে সময়ে 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' প্রতিমাসেই প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করছে, সে সময়ে তত্ত্বকৌমুদী উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লাভ করেছে।—'তত্ত্বকৌমুদী-গত তিন মাসে ইহার আয় ২২১৸৵১০, ব্যয় ১৮৪৲।' ১লা কার্তিকের (১৮০৫ শক) পূর্বের তিন মাসে আয় হয়েছিল ১২০৶২।

শিবনাথ আপন নিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তত্ত্বকৌমুদীর প্রচারে যে গতিবেগ সঞ্চারিত করেছিলেন, তার ফলে আজ দীর্ঘ ৯৫ বছর ধরে সেই পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। সে যুগের কোন সাময়িক (পাক্ষিক) পত্রিকাই অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়ে এমন দীর্ঘ জীবন লাভে সমর্থ হয় নি।

### ৬ ॥ সখা ॥

শিশুদের উপযোগী পত্রিকা প্রকাশের প্রথম পর্বে 'সখা' একখানি উচ্চ অঙ্গের মাসিক পত্রিকা ছিল। তরুণ বয়স্ক প্রমদাচরণ সেন এই পত্রিকাটি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশ করেন। এই প্রমদাচরণ সেন

১। শান্তা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ২৫।
২। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই বৈশাখ ১৮০৫ সংখ্যা।

শিবনাথের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শিবনাথ লিখেছেন, 'প্রমদা হেয়ার স্কুলে আমার নিকট পড়িত···প্রমদা আমার ধর্মপুত্র ছিল।[১]

কাজেই অনুমান করতে বাধা নেই যে, 'সখা'র জন্মমুহূর্ত থেকেই শিবনাথ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আগষ্ট ১৮৮৪ সংখ্যা থেকে শিবনাথ 'সখা'র পৃষ্ঠায় লিখতে শুরু করেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ জুন তারিখে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে প্রমদা-চরণের মৃত্যু হয়। প্রমদাচরণের অকৃতকার্য সমাপ্ত করার জন্য শিবনাথ পরবর্তী জুলাই সংখ্যা থেকে সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। তৃতীয় বর্ষের সপ্তম সংখ্যা ( জুলাই ১৮৮৫ ) থেকে সমগ্র চতুর্থ বর্ষের ( ১৮৮৬ ) সখার সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ। পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যার ( জানুয়ারি ১৮৮৭ ) সম্পাদকীয়ও তিনি লিখেছিলেন।

'সখা' পত্রিকায় শিবনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় ( আগষ্ট, ১৮৮৪ )—'স্বর্গীয় শ্যামাচরণ দে ( বিশ্বাস )' নামক একটি সচিত্র জীবনী। সম্পাদক হিসাবেও তিনি 'সখা'র পৃষ্ঠায় বহু জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। আমরা সেগুলির উল্লেখ করছি :—রামতনু লাহিড়ী ( মার্চ ১৮৮৫ ), প্রমদাচরণ সেন ( জুলাই ১৮৮৫ ), পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( অক্টোবর ১৮৮৫ ), বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর ( জানুয়ারি ১৮৮৬ ), জোসেফ ম্যাটমিনি ( মার্চ, ১৮৮৮ ), স্যার উইলিয়ম জোন্স ( জুন ১৮৮৬ ), স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ ), পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ( অক্টোবর ১৮৮৬ ), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( জানুয়ারি ১৮৮৭ )।

অন্যান্য বহু শিশুপাঠ্য রচনার মধ্যে সাধের নৌকা ( সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ ) আবদারে ছেলে ( জানুয়ারি ১৮৮৬ ), রামকান্তের ঘোড়া ( মে ১৮৮৬ ), শ্যামচাঁদের পাঁচদশা ( সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ ), পেটুক পুষি ( জানুয়ারি ১৮৮৭ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'সখা'র পৃষ্ঠায় একটি নূতন বিষয়ের সূত্রপাত করেন শিবনাথ। সেটি হল বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা। 'বায়ুমণ্ডল' নামে একটি অসমাপ্ত বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা জুন ১৮৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১। শিবনাথ শাস্ত্রী আত্মচরিত, পৃঃ ১৯৬।

প্রমদাচরণ যে উদ্যোগ ও কৃতিত্বের সঙ্গে 'সখা'কে প্রথম শ্রেণীর শিশু-মাসিকে পরিণত করেছিলেন, শিবনাথ তাঁর সহজাত অধিকার ও পূর্ব অভিজ্ঞতাবলে পত্রিকাটিকে পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। প্রমদা-চরণের মৃত্যুর পর প্রমদার বহু অপ্রকাশিত রচনা শিবনাথ এই পত্রে প্রকাশ করেন। নূতন লেখকগণের মধ্যে চিরঞ্জীব শর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ ইনি ছিলেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। এঁর লেখা একটি কবিতা 'ছেলেখেলা' প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১৮৮৫ সংখ্যায়। এই ঔদার্য আরও প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকাটির অসাম্প্রদায়িক চরিত্রে। তবু প্রমদাচরণ ব্রাহ্মভাবপূর্ণ রচনা প্রকাশের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রমদাচরণ যা পারেন নি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হয়েও শিবনাথ তা পেরেছিলেন। তিনি স্পষ্টতঃই বুঝেছিলেন যে সম্প্রদায়গত গোঁড়ামির গণ্ডী পার হলেই তবে শিশুদের বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে যোগ করা সম্ভব হবে। ফলে হিন্দু-ব্রাহ্মের মধ্যগত ভেদ-রেখাটি লুপ্ত হয়ে যথার্থ শিশুপত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'সখা' সম্পাদনা করেন অন্নদাচরণ সেন। জুন ১৮৮৭ সংখ্যার পর শিবনাথের কোনো রচনা ( অন্ততঃ স্বনামে ) প্রকাশিত হতে দেখি না। এ ছাড়া, মে ১৮৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভরত বিলাপ' নামক কবিতাটি এবং জুন ১৮৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বায়ুমণ্ডল' নামক রচনাটির শেষে 'ক্রমশঃ' লেখা থাকা সত্ত্বেও রচনা দুটি আর প্রকাশিত হয় নি। অনুমান করি, হয়ত এই সময় থেকে কোন কারণে শিবনাথের সঙ্গে তৎকালীন 'সখা' সম্পাদকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

### ৭ ॥ মুকুল ॥

'সখা'র ক্ষেত্রে শিশুসাহিত্যের সঙ্গে শিবনাথের পরিচয়ের অঙ্কুর 'মুকুলে' গিয়ে মুকুলিত হয়ে উঠল। বাংলা ১৩০২ সালের আষাঢ় মাসে ( ইংরেজি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ ) শিবনাথের সম্পাদকত্বে 'মুকুল' প্রকাশিত হয়। গুরুচরণ মহলানবিশের কন্যা সরলা, ভগবানচন্দ্র বসুর কন্যা লাবণ্যপ্রভা, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী এবং শিবনাথের কন্যা হেমলতার উদ্যোগে একটি নীতি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবনাথ লিখেছেন, 'আমি এই নীতি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকর্তা ও উৎসাহদাতা ছিলাম।...কয়েক বৎসর পরে ( ১৮৯৫ সালে )

ইঁহারা বালকবালিকাদিগের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। তখন আমি তাহার সম্পাদক হইয়া মুকুল নাম দিয়া এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলাম এবং কিছুদিন তাহার সম্পাদকতা করিলাম।'[১]

কয়েকটি বালিকার উদ্যোগে এই ধরণের পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাস নবতর সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সঙ্গে 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নামও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। '১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবত শিশুদের কোন ভাল কাগজ ছিল না।···শিশুদের আনন্দ দিবার জন্য ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানত তাঁর ( রামানন্দ ) উদ্যোগে ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের উৎসাহে 'মুকুল' নাম দিয়া একটি শিশুপাঠ্য সচিত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সকল উৎসাহী যুবকেরা বলিয়া-কহিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে মুকুলের সম্পাদক করেন। সহকারী সম্পাদক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা বসু। আত্মভোলা উদাসীন রামানন্দ অন্তরালে ছিলেন, কিন্তু কি রচনা সংগ্রহে কি স্বয়ং রচনায় তাঁর উৎসাহ ইহাদের অপেক্ষা বেশী বই কম ছিল না।'[২]

সচিত্র এই মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় করা হয়েছে। 'জ্ঞানের মুকুল, প্রেমের মুকুল, সকল ভাল বিষয়েরই মুকুল অবস্থা আছে। এই পত্রিকা যাহাদের জন্য, তাহারাও মুকুল, মানব মুকুল।···মানব মুকুলদিগকে ফুটাইবার পক্ষে সাহায্য করাই মুকুলের উদ্দেশ্য।···আমরা মানব মুকুলদিগের হস্তে জ্ঞানের মুকুল দিব, যাহা তাহাদের জীবনে ফুটিয়া ফুল ফলে পরিণত হইবে।' বাস্তবিকই পত্রিকাটি বিচিত্র জ্ঞানের মুকুলে সুরভিত হয়ে উঠেছিল। যে 'মানব মুকুলদের' প্রয়োজন স্মরণ করে গল্প, হেঁয়ালি, কবিতা ও চিত্রের বিচিত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল, উদ্যোক্তাগণ যে তাদের সম্পর্কে কতখানি সজাগ ছিলেন, মুকুলের পৃষ্ঠাতেই তার প্রমাণ রয়েছে। 'অনেকের ধারণা আছে, মুকুল ছোট ছোট শিশুদের জন্য, অর্থাৎ যাহাদের বয়স ৮।৯ বৎসরের মধ্যে প্রধানত তাহাদের জন্য। মুকুলে এমন অনেক কথা থাকে, যাহা এত অল্প

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৯৬।
২। শান্তা দেবী, রামনন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ৪৮।

বয়স্ক শিশুগণ বুঝিতে পারে না, এবং বুঝিবার কথাও নহে। যাহাদের বয়স ৮।৯ হইতে ১৬।১৭র মধ্যে ইহা প্রধানতঃ তাহাদের জন্য। আমরা লিখিবার সময় এই বয়সের বালক-বালিকাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখি।'[১] এ থেকে মুকুলের রচনাগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই একটা ধারণা মুকুলের পাঠকগণের পক্ষে করে নেওয়া সহজ হয়েছিল। বয়সের কথা প্রসঙ্গে মনে হতে পারে যে ১৬।১৭ বছরের ছেলেদের উদ্দেশ্যে রচিত লেখাগুলি যথার্থই শিশুপাঠ্য কিনা। প্রমথ চৌধুরী স্পষ্টতঃই বলেছিলেন, 'শিশু সাহিত্য বলে কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারে না। কেন না শিশু-পছন্দ সাহিত্য শিশু ব্যতীত অপর কেউ রচনা করতে পারে না; আর শিশুরা সমাজের আর যে অত্যাচারই করুক না কেন, সাহিত্য রচনা করে না।' তাঁর মতে শিশুপাঠ্য না হোক বালকপাঠ্য সাহিত্য আছে এবং থাকা উচিত।[২] প্রমথ চৌধুরীর মতের সঙ্গে শিবনাথের মতের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। বলা যেতে পারে শিশুপাঠ্য পত্রিকা সম্পর্কে বয়সের এই সীমা নির্ধারণ সঠিক এবং বিজ্ঞান-সম্মত।

কাগজটিকে সর্বপ্রকারে আকর্ষণীয় করার ব্যাপারে শিবনাথের বিচিত্র প্রয়াস কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়। রচনা-বৈচিত্র্য ব্যতীত নানাবিধ কৌতুককর বিজ্ঞাপন, রচনা সম্পর্কে পাঠকগণের মতামত আহ্বান, শিশুরচনা প্রকাশ মুকুলের বৈশিষ্ট্য ছিল। "তোমরা মুকুলকে ভালবাস, একথা কি আমাদিগকে জানিতে দিবে না?...যাহারা মুকুলকে ভালবাস, তাহারা যদি এক একখানি পোষ্টকার্ডে "আমি মুকুলকে ভালবাসি", এই কয়টী কথা লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া পাঠাও, তবে আমরা সেই কার্ডগুলি রাখিয়া দিব—[৩]"। মুকুলকে জনপ্রিয় করার জন্য এই চিন্তা অভিনব বলা যেতে পারে। অবশ্য শিবনাথ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দৃষ্টান্তে এই প্রকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আবার বালক-বালিকাদের সৎকার্যের নানা বিবরণের প্রকাশের ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে পাঠক বৃদ্ধির ব্যাপারে সহায়তা করেছিল।

কিন্তু যে গুণে মুকুল শিশুচিত্তকে সর্বাধিক পরিমাণে আকর্ষণ করতে

১। মুকুল কাহাদের জন্য? মুকুল, ১ম ভাগ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০২, পৃঃ ১৭।
২। সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২৩।
৩। নববর্ষের সম্ভাষণ, মুকুল, ২য় ভাগ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩০৩।

সমর্থ হয়েছিল, তাহল এর চিত্র-সম্পদ। প্রায় প্রতিটি রচনা চিত্রসমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হত। ছবিগুলি অনেক সময়ে বিলাতী পত্র-পত্রিকা থেকে গৃহীত হত। তাছাড়া মধ্যে মধ্যে নানা আখ্যান-ভিত্তিক চিত্রাবলী ছাপিয়ে সে সম্পর্কে কবিতা ইত্যাদি রচনার আহ্বান জানিয়ে তরুণ লেখকদের উৎসাহ দেওয়া হত। চতুর্থ বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় চিত্র-অনুসারে কবিতা লিখে বালক বারীন্দ্র কুমার ঘোষ পুরস্কার পান।[১] পরে এই ছবিগুলির অনেকগুলি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের গ্রন্থসমূহে তাঁর স্বরচিত কবিতাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফলে ছবিগুলি অবলীলাক্রমে যোগীন্দ্রনাথেরই স্বত্বাধিকার পেয়েছে। অথচ শিবনাথের কথা আজ আর কেউ ভাবে না। কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত 'বালকবন্ধু' থেকে 'মুকুল' পর্যন্ত সব পত্রিকাতেই রচনার সঙ্গে চিত্র মুদ্রিত হয়ে এসেছে। সেদিক থেকে শিবনাথ নূতন কিছু প্রবর্তন করেন নি। কিন্তু ছবি ছাপার ব্যাপারে মুকুলের কর্তৃপক্ষের প্রয়াস যে কতখানি আন্তরিক ছিল, শান্তা দেবী তার সাক্ষ্য দিয়ে লিখেছেন, "'মুকুলে' একটি মাত্র কবিতায় রঙীন ছবি দিবার জন্য ইহারা পোটো ডাকিয়া আনিয়া কাঠের ব্লকে ছাপা প্রতি কপি আলাদা আলাদা করিয়া হাতে রং দেওয়াইয়াছিলেন।"[২]

'মুকুলে'র সম্পাদক হিসাবে শিবনাথের অপর সিদ্ধি লেখকগোষ্ঠী আহ্বান ও নূতন লেখক আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত। সম্পাদক হিসাবে তিনি নিজে তো লিখতেনই, তাছাড়া বাংলা দেশের তৎকালীন সমস্ত প্রতিভাকে তিনি 'মুকুলে'র পৃষ্ঠায় আকর্ষণ করেছিলেন। প্রথম বৎসরের 'মুকুলে' সর্বমোট ২৯ জন লেখক-লেখিকার মধ্যে অবলা বসু, কুসুমকুমারী দাস, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রমণীমোহন ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেন্দ্র কুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বছরে লিখেছেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, অমৃতলাল গুপ্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বালক সুকুমার রায়, হরিহর শেঠ, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, অতুলপ্রসাদ সেন, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

১। 'শ্রীমান বারীন্দ্র কুমার ঘোষের লেখাটি চলনসই রকমের হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকেই ৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।'—মুকুল, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫, পৃঃ ৩২।

২। শান্তা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ৪৮।

প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ। উপর্যুক্ত দীর্ঘ তালিকা থেকে পত্রিকা হিসাবে 'মুকুলে'র মূল্য স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়। এতগুলি প্রতিভার একত্র সমাবেশ তৎকালীন, এমন কি বর্তমানেও কোন পত্রিকায় সম্ভব হয়নি—এমন মন্তব্য করা অযৌক্তিক হবে না।

প্রতিষ্ঠিত লেখকগণকে আহ্বান করা ব্যতীত নূতন লেখক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে শিবনাথের কৃতিত্ব অনেকাংশে গুপ্তকবির সঙ্গে তুলনীয়। বঙ্কিম, দীনবন্ধু প্রভৃতি শিষ্যবৃন্দের গুরু হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, শিবনাথ অবশ্যই সেই মর্যাদার অধিকারী। কারণ সুকুমার রায়, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রভৃতি বালককে রচনার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েতাঁদের উত্তরকালের সাহিত্য-সাধনায় শিবনাথ প্রথম গতিবেগ সঞ্চার করেছিলেন। আট বছরের বালক সুকুমার রায়ের প্রথম কবিতা 'নদী' মুকুলেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল—জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ সংখ্যায়। বারীন্দ্র কুমার ঘোষের পুরস্কার প্রাপ্তির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বালক-বালিকারা যাতে সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হয়, সেজন্য শিবনাথ নানা পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। চিত্র-কাহিনী রচনা আহ্বান, 'কোনও পাঠিকার একটি সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা ছাপিয়া' প্রকাশ, বালক-বালিকাগণের নানাপ্রকার সৎকার্যের বিবরণ প্রকাশ, ধাঁধাঁর উত্তরদাতাদের (১৬ বছরের অনধিক) বর্ষশেষে দশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা, বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি পৃষ্ঠায় মেয়েলী ঘরকন্না বিষয়ে রচনা প্রকাশ ইত্যাদি দ্বারা পাঠক-পাঠিকা মহলের একাংশকে রচনাকর্মে আকর্ষণ করেছিলেন সম্পাদক শিবনাথ। আধুনিক কালে শিশুপাঠ্য পত্রিকায় বালকদের জন্য কয়েকটি পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট রাখা হয় তাদের সাহিত্যকর্মে অনুপ্রাণিত করার জন্য, শিবনাথ শাস্ত্রীই ছিলেন এর পথপ্রদর্শক।

লেখকদের মত লেখাগুলিও লক্ষ্য করার মত! কেবলমাত্র মুকুলের পৃষ্ঠা থেকেই শিবনাথ এবং অন্যান্য লেখকদের রচনা সংগ্রহ করে একটি মনোরম শিশুপাঠ্য সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব—এমনই রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। কুসুমকুমারী দাসের সুবিখ্যাত 'আদর্শ ছেলে' (পৌষ ১৩০২), জগদীশচন্দ্র বসুর 'গাছের কথা' (আষাঢ় ১৩০২) ও 'মন্ত্রের সাধন' (কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩০৫), রবীন্দ্রনাথের 'কাগজের নৌকা' (আশ্বিন ১৩০২) ও 'সুখ ও দুঃখ' (শ্রাবণ ১৩০৩), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের রামায়ণের' প্রথমাংশ (শ্রাবণ ১৩০৩), যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'মজার মুল্লুক' (কার্তিক

১৩০৫ ) প্রভৃতি সুবিখ্যাত রচনাগুলি 'মুকুলে'র পৃষ্ঠাতেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। শিবনাথের লেখা শিশুপাঠ্য গল্প-সংকলন সম্প্রতি 'ছোটদের গল্প' ( ১৯৬৪ ) নামে প্রকাশিত হয়েছে।

চিত্র-রচনাগুলিতে সব সময়েই পাঠকগণকে লেখার জন্য আহ্বান করা হত। পূর্বোল্লিখিত বারীন্দ্র কুমার ঘোষের চিত্র-রচনাটির উপর যোগীন্দ্রনাথ সরকার আর একটি কবিতা 'বেজায় ধূর্ত' নাম দিয়ে লিখেছিলেন ; এটি তাঁর 'হাসিরাশি' বইটিতে সংকলিত আছে। সম্পাদক হিসাবে শিবনাথও ছবিগুলির কোন কোনটির উপর কবিতা রচনা করতেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' ( ভাদ্র ১৩০২ ) কবিতাটির উল্লেখ করছি। এই ছবিটির উপর যোগীন্দ্রনাথ সরকারও 'সাপ নয় তো যম' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

'মুকুল' পত্রিকার অপর বৈশিষ্ট্য ছিল নানা জীবনী প্রকাশ করে পাঠককুলের সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপনের মধ্যে। স্বয়ং সম্পাদক এই ধরণের জীবনী[১] রচনায় সর্বাধিক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। জাতীয় গৌরববোধ, স্বদেশপ্রেম ও চরিত্রগঠন—এই রচনাগুলির প্রধান শিক্ষা ছিল।

শিশুদের জন্য নানা ভৌতিক রচনা আধুনিক কালের শিশুপাঠ্য পত্রিকাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। শিশুদের পক্ষে এই ধরণের তরল চিন্তা ক্ষতিকর হবে ভেবে সম্ভবতঃ শিবনাথ 'মুকুলে' কোন ভূতের গল্প প্রকাশ করেন নি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'বলবন্ত সিংহ'কে কোনক্রমেই ভৌতিক গল্প বলা চলে না। বরং একে রূপকথা জাতীয় রচনা বলাই সঙ্গত।

এই রূপকথার রস পরিবেষণে শিবনাথের যত্নের ত্রুটি ছিল না। সেজন্যে তিনি নিজে বিদেশী রূপকথার অনুবাদ করে 'মুকুলে' প্রকাশ করেছিলেন।[২] উপকথাগুলি যথাক্রমে এই ;—১. সখের যাত্রার দল ( আশ্বিন ১৩০২ ), ২. কাঠুরের মেয়ে ( কার্তিক ১৩০২ ), ৩. হাতকাটা মেয়ে ( পৌষ ১৩০২ ), ৪. না বুঝে ক'রিলে কাজ শেষে হায় হায় ( মাঘ ১৩০২ ), ৫. হংসরূপী রাজপুত্র ( চৈত্র ১৩০২ )।

১। শিবনাথ-রচিত এই ধরণের একটি জীবনী-সংকলন 'স্বনামা পুরুষ' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ( ১৯৬৪ )।

২। ১৯০৭ সালে শিবনাথ-কর্তৃক 'উপকথা' নামে প্রকাশিত।

আধুনিক কালে 'একটুখানি হাসো' ইত্যাদি নাম দিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় যে স্তম্ভ থাকে, সেই ধরণের চুটকি রচনার সূত্রপাত শিবনাথ 'মুকুলে'ই প্রথম প্রকাশ করেন। কৌতূহলোদ্দীপক হবে ভেবে একটি উদাহরণ উদ্ধার করছি :—

মা। কিরে হরে, তুই কাঁদছিস যে ?

ছেলে। ভোলা—আ—আ—আমাকে মে—রে—ছে—।

মা। তুই তাকে আচ্ছা করে ফিরিয়ে দিলিনে কেন ?

ছেলে। আ—মি—আগেই ফিরিয়ে দি—ছি—লু—ম !'[১]

সম্পাদক হিসাবে শিবনাথের কৃতিত্বের কথা আমরা আর একবার আলোচনা করছি। সম্পাদকের যে একটা দায়-দায়িত্ব থাকে সম্পাদনার ব্যাপারে, শিবনাথ সে সম্পর্কে পুরো মাত্রায় ওয়াকিবহাল ছিলেন। কোন রচনা প্রকাশ করার পূর্বে তাকে প্রয়োজন বোধ করলে সংস্কার করে নিতেন। আবার রচনার মৌলিকতা বিষয়ে সন্দেহ জাগলে তিক্ত-কষায় ভাষায় সমালোচনাও করতেন। কোন এক গ্রাহক কর্তৃক প্রেরিত 'সর্পের কৃতজ্ঞতা' ( আশ্বিন ও কার্তিক ১৩০৪ ) নামক রচনাটি প্রকাশ করে সম্পাদক পাদটীকায় লিখেছেন, 'গল্পটী সত্য কিনা জানি না, কোন্ পুস্তকে তিনি এই গল্পটী পাইয়াছেন, লেখক তাহা জানাইলে, ভাল হইত। শেষ অংশ অসম্ভববোধে পরিত্যক্ত হইল।' ফজলে করিম নামক এক পাঠক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'জ্ঞানমুকুল' বইয়ের 'ছোটপাখী' নামক কবিতাটি চুরি করে প্রকাশ করতে চাইলে শিবনাথ তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন ( জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩, পৃঃ ৩১ )। দশচক্রে ভগবানের প্রেতযোনি-প্রাপ্তির প্রবাদ আমরা জানি। কিন্তু স্বয়ং সম্পাদককেও একবার এই প্রকারের পরস্বাপহরণের অভিযোগে সোপর্দ হতে হয়েছিল। 'পত্র প্রেরকদিগের প্রতি'[২] স্তম্ভে লক্ষ্য করি 'মুকুলে'র একজন 'হিতাকাঙ্ক্ষী' সম্পাদকরচিত 'তিনটি বর' ( আষাঢ় ১৩০৩ ) নামক গল্পটি শিবনাথ কোথা থেকে অপহরণ করেছেন—এমন ইঙ্গিত করে চিঠি লেখায় শিবনাথ লিখেছেন যে, 'পত্রপ্রেরকের নাম জানিতে পারিলে, আর কোন উপকার না হউক, তাঁহার শিক্ষা এবং রীতিনীতির

১। মুকুল মাঘ ১৩০২, পৃঃ ১০৭।

২। মুকুল শ্রাবণ ১৩০৩, পৃঃ ৬৩।

সুবন্দোবস্তের জন্য অন্ততঃ তাঁহার পিতামাতাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে পারিতাম।'

সুসম্পাদনার গুণে মুকুলের বহুল প্রচার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশের প্রায় দেড় বছরের মধ্যে 'মুকুলে'র গ্রাহক সংখ্যা দেড় সহস্রাধিক হয়েছিল—'আমাদের দেড় হাজারেরও অধিক গ্রাহক আছেন……'[১]। গ্রাহকদের মধ্যে মুকুলের প্রভাব কেমন ছিল, সে সম্পর্কে দৌলতপুর-নিবাসী জনৈক কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 'সংকটে প্রাণরক্ষা' নামক যে চিঠিটি সম্পাদককে পাঠিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করা যেতে পারে। বিরাট এই চিঠিটির বক্তব্য হল এই যে, একটি বালক নিদারুণ অসুস্থ হয়ে যখন বিকারগ্রস্ত হয়, তখন 'মুকুল' পত্রিকা পাঠে সে আশ্চর্যজনকভাবে রোগমুক্ত হয়। 'মুকুলে'র এই মুষ্টিযোগ দেখে বালকটির পিতা বলেন, 'যেদিন মুকুল আসে বাছার মুখে সেদিন আর হাসি ধরে না। এমন সুন্দর কাগজের যাহাতে বহুল প্রচার হয় তাহার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিব।[২] ঘটনাটি কল্পিত কিনা জানি না, তবে মুকুলের প্রচার এত বেশি হয়েছিল যে তার প্রশংসা সুদূর ইংলণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল,—মুকুলের একটি বিজ্ঞাপন থেকে একথা জানতে পারি।

১৩০৭ সাল পর্যন্ত সম্পাদনা করার পর শিবনাথ 'মুকুলে'র সম্পাদকতা ত্যাগ করেন এবং হেমচন্দ্র সরকার সেই ভার গ্রহণ করেন। বয়োবৃদ্ধি ও অসুস্থতার কারণে শিবনাথ এই ভার ত্যাগ করেন বলে মনে হয়। কিংবা হয়ত মুকুলের প্রকৃতির সমতা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে যে কোন কারণেই সম্ভব হচ্ছিল না। 'সাহিত্য' পত্রিকার একটি সমালোচনায় এমন ইঙ্গিত লক্ষ্য করি;—'পৌষ ও মাঘ। মুকুল শুকাইয়া যাইতেছে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। শিশুপাঠ্য একমাত্র মাসিকের এই দশা! দেশের প্রশংসা করিব, না অদৃষ্টের নিন্দা করিব?…মুকুল আমাদের বড় আদরের,—মালীর নিকট প্রার্থনা করি, মুকুল যেন শুকাইয়া ঝরিয়া না যায়।'[৩]

১। মুকুল, পৌষ ১৩০৩, পৃঃ ১৩০।
২। মুকুল, ফাল্গুন ১৩০৩, পৃঃ ১ ৯-৭৩।
৩। সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০৭, পৃঃ ৭০৪।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### পত্রিকা কথা

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভারত সংস্কার সভার মদ্যপাননিবারণী শাখার মুখপত্র 'মদ না গরল' পত্রিকা-সম্পাদনায় হাতে খড়ি হওয়ার পর দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে শিবনাথ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করে সম্পাদক হিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। পূর্বালোচিত পত্রিকাগুলি ছাড়া আরও দুটি পত্রিকার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাটির সঙ্গে স্বল্পদিনের জন্য সম্পাদনার ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন। রামগতি ন্যায়রত্ন 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদক তালিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র ছাড়া আরও দুজনের নাম উল্লেখ করেছেন[১] —এঁরা হলেন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রী।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণকুমার মিত্রকে তৎকালীন সরকার নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করলে 'সঞ্জীবনী'র প্রকাশে বিঘ্ন ঘটে। অথচ পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশের ব্যাপারে শিবনাথের উদ্বেগের অবধি ছিল না। এই সময়ে শিবনাথ যে 'সঞ্জীবনী'র পরোক্ষ সম্পাদক হয়ে পড়েছিলেন, তার কয়েকটি প্রমাণ আমরা তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে উল্লেখ করছি। 'কৃষ্ণকুমারবাবুকে যে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাঁহার অনুপস্থিতকালে সঞ্জীবনী যে কিরূপে চালান যাইবে সে বিষয়ে পরামর্শ হইল' (ডায়েরীর তারিখ ২০-১২-১৯০৮)। এই পরামর্শ তিনি সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, গগনচন্দ্র হোম প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সঙ্গে করেছিলেন। সঞ্জীবনী কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনীর নামে প্রকাশিত হতে লাগল। কিন্তু শিবনাথই সে ব্যাপারে মুখ্য সহযোগী হলেন। তিনি লিখেছেন 'সঞ্জীবনী আপিসে কৃষ্ণকুমার বাবুর পরিবারদিগকে দেখিতে গেলাম। সেখানে মুখে মুখে সঞ্জীবনীর জন্য কিছু বলিলাম, কুমুদিনী লিখিয়া লইলেন' (২১.১২ ১৯০৮)। পরদিনের (২২.১২.১৯০৮) ডায়েরীতেও তিনি লিখেছেন, '...কৃষ্ণকুমার

১। রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব (৪র্থ সং ১৯৩৫ (১৩৪২). পৃঃ ৩৪১।

মিত্রের বাড়ীতে গিয়া সঞ্জীবনীর জন্য কিছু কিছু dictate করি, কুমুদিনী লেখেন।'

'বঙ্গবাসী' পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারেও শিবনাথের যত্নের ত্রুটি ছিল না। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছে, 'আজকালকার যুবকেরা জানে না যে, 'বঙ্গবাসী'র গঠনে তিনি ( শিবনাথ ) কতখানি বুকের রক্ত ঢালিয়াছিলেন।'[১] এই প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের প্রেরণা শিবনাথই তাঁকে প্রথম দিয়েছিলেন।'

সম্পাদকের আরও একটি দায়িত্ব শিবনাথ সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন ; সেটি হল সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় ও স্বসম্পাদিত পত্রে বিনা পারিশ্রমিকে বিপুল সংখ্যায় রচনা প্রকাশ। সাংবাদিকের ভাষায়, 'আজকালকার সম্পাদক ও লেখকগণের নিকট ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় প্রতিভাশালী ও খ্যাতনামা লেখক বিনা পারিশ্রমিকে এতগুলি সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিষয়ে এত প্রবন্ধ দিতে পারিয়াছেন।'[২] আসলে সাংবাদিকের সত্য-নিষ্ঠা ও নিস্পৃহতা এর পশ্চাতে সক্রিয় ছিল।

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৬, স্বর্গত নবম অধিবেশন, পৃঃ ৬৮-৭২।

২। সাংবাদিক সুধীরকুমার লাহিড়ীর এই উক্তি জীবনময় রায় কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্রঃ, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৪, 'শিবনাথ জন্মশতবার্ষিকী' নামক প্রবন্ধ।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# অপ্রকাশিত রচনাবলী

কোন লেখকের অপ্রকাশিত রচনাবলীর আবিষ্কার সেই সেই লেখকের জীবন, সাহিত্যিক প্রতিভা ও সাহিত্যমূল্য বিচারে প্রভূত সহায়তা ক'রে থাকে। আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর তিন প্রকারের অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান পেয়েছি—কবিতা, কুলপঞ্জিকা এবং ব্যক্তিগত ডায়েরী বা দিনলিপি।

শিবনাথের স্বহস্ত-লিখিত[১] কবিতার যে খাতাখানি[২] আমরা পেয়েছি, তা আদ্যন্ত খণ্ডিত। ফলে তার প্রথম ও শেষ দিকের বিলুপ্ত অংশে কোন কবিতা ছিল কিনা তা বলা কঠিন। তাছাড়া, খাতাটিতে কোন পৃষ্ঠাঙ্ক নেই বলে ভিতরের কোন পাতা কবিতাশুদ্ধ হারিয়ে গেছে কিনা, তা ধরা যাচ্ছে না। খাতাটি খুবই জীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে। এই খাতাখানিতে অনেকগুলি কবিতা রয়েছে। কিন্তু সেগুলি যে সবই অপ্রকাশিত এমন দাবী আমি করি না। কারণ কয়েকটি কবিতার উপরে শিবনাথ selected ও held back এই শব্দ দুটি লিখে রেখেছেন। এ থেকে অনুমান করি, শিবনাথ হয়ত selected চিহ্নিত কবিতাগুলি কোথাও প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিংবা সেই কবিতাগুলি নিয়ে 'পুষ্পমালা' বা 'পুষ্পাঞ্জলি'র মত আরও একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা তাঁর দিল। প্রথম প্রকারের অনুমানের কারণ এই যে, এই selected লেখা কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩] একটি কবিতা সম্পর্কে শিবনাথের পার্শ্ব-মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—'পূজাবন্ধু কাগজে দিলাম।' পূজাবন্ধু বলতে সম্ভবতঃ তিনি 'ধর্মবন্ধু' কাগজের কথা বুঝিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রকার অনুমানের কারণ এই যে, অপ্রকাশিত ডায়েরীতে[৪] শিবনাথ 'প্রসূন প্রক্ষেপ' নামে আরও একটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আর held back চিহ্নিত কবিতাগুলিকে তিনি হয়ত সংশোধন না করে প্রকাশ

১। একটি কবিতা তাঁর স্বহস্ত-লিখিত নয়।

২। শিবনাথের পৌত্র শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য আমাকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন।

৩। যথা 'সংসার সরসীজলে' কবিতাটি 'সন্দেশ', কার্তিক ১৩২৬-এ প্রকাশিত হয়।

৪। অপ্রকাশিত ডায়েরীর তারিখ ১৯.৮.১৯০৯।

করতে চান নি। সে যাই হোক্, খাতাভুক্ত কবিতাগুলির মধ্যে যে কয়টি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানতে পেরেছি, তা বাদ দিলে আরও প্রায় পৌনে একশতটি কবিতা থাকে। সেই কবিতাগুলির মধ্যে কোন কোনটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, তা বলা দুঃসাধ্য। কারণ তৎকালীন সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি মোটেই সুলভ্য নয়। অবলাবান্ধব, আলোচনা, ভারত শ্রমজীবী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্রিকা সমূহের ফাইল অনেক অনুসন্ধানেও পাওয়া যায় নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শিবনাথের পুস্তকাকারে প্রকাশিত রচনাগুলি ব্যতীত আরও বহু রচনা বিভিন্ন সাময়িকপত্রে ছড়িয়ে আছে। আমরা সাধ্যমতো সেগুলি উদ্ধার করে বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছি।

আদ্যন্ত খণ্ডিত এই খাতাটির রচনাকর্ম কোন তারিখ থেকে আরব্ধ হয়েছিল, তা জানার উপায় নেই। তবে খাতাটি থেকে যে কবিতাগুলি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেচে, তাতে রচনার তারিখ হচ্ছে ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯১৩ (২৫এ এপ্রিল) পর্যন্ত। এই পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে বলেই শিবনাথের লেখা শেষ কবিতা কোনটি তা জানতে পারা গেছে। সেটি হচ্ছে ২৫.৪.১৯১৩-তে লিখিত 'গাড়ির বলদ' শীর্ষক কবিতাটি[১]। আমরা এই দীর্ঘ কবিতাটির প্রথম স্তবক এখানে উদ্ধৃত করছি।

গাড়ির বলদ

'৭৮ ল্যান্সডাউন রোড্, বালিগঞ্জ কলিকাতা ২৫-এ এপ্রেল ১৯১৩' তারিখে রচিত।

গাড়িতে বলদ বাঁধা মুখে তার ঠুলি,
লাগাম চাবুক পিছে চালকের বুলি ;
একি দুঃখ হায় হায়,
তবু আশে পাশে চায়,
তৃণ গুল্ম খেতে চায় তবু মুখ তুলি ;
দাঁড়ায় পথের পাশে নিজ কাজ ভুলি ! ইত্যাদি।

১। শিবনাথ-কন্যা হেমলতা দেবী তাঁর শিবনাথ-জীবনী গ্রন্থে 'ভুলচুক দুষ্প্রবৃত্তি' শীর্ষক কবিতাটিকে শিবনাথের রচিত শেষ কবিতা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি ২৩.৩.১৯১৩ সালে লেখা।

খাতাভুক্ত সমস্ত কবিতা এখানে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। আর সে প্রয়োজনও অনুভব করি না। কারণ কবিতাগুলিতে শিবনাথের কবিজীবনের নূতন কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি না। অপ্রকাশিত কবিতাগুলির প্রায় সবই তাঁর আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে দেশপ্রীতিমূলক, আখ্যানমূলক, প্রকৃতিবিষয়ক, শিশুপাঠ্য ইত্যাদি কবিতারও সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু এগুলিতে কোন নূতন কথা নেই। যে কবিতাগুলি অন্যান্য কারণে উল্লেখযোগ্য, আমরা সেগুলিরই মাত্র এখানে আলোচনা করছি।

১॥ 'কটক তুলসীপুর, কুমারিকা কুঠীতে ১৯১৩ সালের ১লা মার্চ দিবসে লিখিত' একটি আখ্যানমূলক কবিতা শিবনাথের এই খাতাতে থাকলেও শিবনাথ নিজের হাতে এই কবিতাটি খাতায় লেখেন নি। কারণ হস্তলিপি পৃথক ধরণের। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখার প্রয়োজন যে, কোন কোন কবিতা খাতাটিতেই প্রথম লেখা হয়েছে, আবার কোন কোনটি অন্য পাণ্ডুলিপি থেকে এই খাতায় নকল করে নেওয়া হয়েছে। একটি কবিতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্যে লিখেছেন, 'বিগত বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে এপ্রেল মাসে যখন Mrs. Rai-কে লইয়া আমর্গাও নামক স্থানে বাস করি, তখন কবিতাটির কিয়দংশ পেনসিলে একখানি কাগজে লিখিয়া রাখি। এ বৎসর কলিকাতাতে তাহা সমাপ্ত করি। অদ্য এই পুস্তকে নকল করিলাম। কলিকাতা। ২০ মে ১৮৯৯।' আবার এই কবিতাটিরই লেখার ইতিহাস অন্যত্র উল্লিখিত রয়েছে এইভাবে—'জীবনের অবশিষ্ট কাল কিরূপে লোকের স্তুতি নিন্দার প্রতি উদাসীন হইয়া ঈশ্বরচরণে আপনাকে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে নিম্নলিখিত কবিতাটির ভাব মনে আসিল।[১]

২॥ '৭৮ ল্যান্সডাউন রোড্ বালিগঞ্জ'—এই ঠিকানায় শিবনাথ যখন বাস করছিলেন, তখন ১৮ই এপ্রিল ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম 'তুমি ডেকেছ প্রভু তুমি ত এসেছ' ইত্যাদি শীর্ষক কবিতাটি লেখেন। কিন্তু সেই প্রাথমিক খসড়া তাঁর পছন্দ হয় নি বলে ২৫.৪.১৯১৩ তারিখে কবিতাটির পরিমার্জিত রূপ দেন। একই বক্তব্যের উপর একাধিক কবিতা রচনা নিঃসন্দেহে লেখকের কাব্যরুচি এবং রচনার উৎকর্ষানুৎকর্ষ বোঝার ব্যাপারে সাহায্য করে। এমন আরও কয়েকটি কবিতা এতে আছে।

১। অপ্রকাশিত ডায়েরী, তারিখ ১.৩.১৯১৩।

৩॥ কোন কবিতা পাঠের পূর্বে যদি কবিতা রচনার ইতিহাসটুকু জানতে পারা যায়, তাহলে কবিতাটি বোঝার ব্যাপারে অনেক সুবিধা হয়। এই পাণ্ডুলিপিটি থেকে আমরা শিবনাথের কয়েকটি কবিতা রচনার-ইতিহাস জানতে পেরেছি।

(ক) চন্দননগরে বাসকালীন ৯.১.১৯০০ তারিখে 'তোমারে দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছি' শীর্ষক কবিতাটি রচনার ইতিহাস শিবনাথ এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, 'গতকল্য কলিকাতা হইতে চন্দননগর আসিবার সময় শিয়ালদহ Lady Elliot Hostel-এ লাবণ্যপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি। তিনি Unitarian দিগের প্রকাশিত Helper নামক মাসিক পত্রিকা হইতে Spirit of God বিষয়ে একটী সুন্দর প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলেন। কথায় কথায় আমি বলিলাম তাঁহারা যথার্থ প্রেমিক যাঁহারা ঈশ্বরকে বলিতে পারে, 'এ জীবনে যাহা কিছু দুঃখ পেয়েছি যা কিছু তিক্ততা সঞ্চয় করেছি সান্তে তোমাকে দেখে ভুলে গিয়েছি।' তিনি এই কথার পোষকতা করিয়া চণ্ডী-দাসের কবিতা হইতে কোন কোন অংশ মুখস্থ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তৎপরে চন্দননগরে চলিয়া আসার পরও ঐ কথোপকথনটা মনে ঘুরিতে লাগিল। অদ্য নিশাশেষে মনে মনে কয়েক পংক্তি রচনা করিলাম, তৎপরে বর্তমান পংক্তিগুলি লিখিতেছি।'

(খ) আরেকটি কবিতা রচনার ইতিহাস হচ্ছে '১৮৮৯ সালে আমাদের আশ্রয়ে পালিতা পরলোকগতা সরলা সেনকে একখানি নোট্‌বুক উপহার দিবার সময় নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলাম।···অদ্য নকল করা গেল—বালিগঞ্জ ২৬ জুন ১৯০৩।'

(গ) ১৯০৬ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে শিবনাথের সর্ববনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনী মারা যান। সেই ঘটনায় কাতর হয়ে শিবনাথ যে কবিতাটি লেখেন, তার ভূমিকায় আছে '১৬ই নভেম্বর কলিকাতা পৌঁছিয়াছি, পৌঁছিয়া জানিলাম সুহাসিনী মারা গিয়াছে। হঠাৎ এ সংবাদে প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। পরেই মনে হইল একজন প্রেমময় পুরুষ আছেন, এ জীবন তাঁহারই হাতে। তদবধি এ কবিতাটি মনে ঘুরিতেছে, আজ লিখিয়া রাখিতেছি।

মন তুমি ইহা কেন দেখ না ?
যদিও বা দেখ তবে কেন রাখ না ?

জগতে জাগিছে প্রেম
জগতে জাগিছে ক্ষেম
সেই প্রেমে প্রেম দিয়ে ক্ষেম কেন চাখ না ?

বালিগঞ্জ, ২৯ নভেম্বর ১৯০৪।'

এই প্রসঙ্গে কন্যা সরোজিনীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে শিবনাথ 'নবশোক'[১] নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন তা স্মর্তব্য। সন্তানদের প্রতি সহৃদয় পিতার স্নেহ, সন্তান বিয়োগে সেই পিতার অন্তর্বেদনা এবং ঈশ্বর-নির্ভরতার ফলে সেই অন্তর্বেদনার দীপ্তিলাভ, এই জাতীয় কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

৪॥ একটি ইংরেজি কবিতার ভাবানুবাদের উল্লেখ করছি। শিবনাথ এই অনুবাদ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'Mrs. Rai-এর মুখে শুনি ১৮৭৮ সালে আমি যখন প্রথম আগরাতে গিয়া তাঁদের ভবনে অতিথি হই তখন নাকি শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয় আমাকে একটী ইংরেজী কবিতা দেখাইয়াছিলেন। ঐ কবিতা দেখিয়া···আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তৎপরে তাহার ভাব···কয়েক পংক্তিতে প্রকাশ করিয়া···ছিলাম।' কবিতাটি নিম্নরূপ :

রমণীয় ··তন্ত্রী সুকোমল তারে
চতুর বাদক বিনা কে বাজাতে পারে ?
পড়িলে মূর্খের হাতে সে বীণা সুন্দর
টানে না অমিয় সুধা মধুর সুস্বর।

চন্দননগর ৯ই জানুয়ারী ১৯০০।[২]

৫॥ শিমলা শৈলে রচিত ৪ঠা অক্টোবর ১৯০৪ তারিখে লিখিত 'পাহাড়ের পাখীদের প্রতি' নামক কবিতাটির সঙ্গে 'পুষ্পমালা' কাব্যগ্রন্থের 'পাখী' কবিতাটি তুলনীয়। অনন্ত আকাশের বুকে উড্ডীয়মান পাখী শিবনাথকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। এ প্রসঙ্গে বলা ভাল যে, পাণ্ডুলিপিতে উদ্ধৃত অধিকাংশ কবিতাই শিমলা শৈল, চন্দননগর গঙ্গাতীর,

১। দ্রঃ, পুষ্পাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ।

২। R. W. Emerson-এর লিখিত Spiritual Laws প্রবন্ধ পাঠের পর শিবনাথ 'ইচ্ছার স্রোত' নামে যে কবিতাটি নদীতীরে বসে লিখেছিলেন, সেটি শিবনাথের মৃত্যুর বহুদিন পর 'আশ্বিন ১৩৬১' সংখ্যায় মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে।

পুরীর সমুদ্রতীর প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশে রচিত। এ থেকে বেশ বোঝা যায়, প্রকৃতির সাহচর্য শিবনাথের অন্তরে কবিত্বশক্তি উদ্বোধন করত।

পাণ্ডুলিপি ব্যতীত আরও একটি শিশুপাঠ্য অপ্রকাশিত কবিতার আমরা সন্ধান পেয়েছি। শিবনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মীরা সান্যাল (শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যালের পত্নী) যখন ৬।৭ বছরের মেয়ে ছিলেন, সেই সময় সর্দি-কাশি থেকে সদ্য-আরোগ্যমুক্ত এই নাতনির চিঠির উত্তরে শিবনাথ শিশুচিত্তনন্দন একটি কবিতার মাধ্যমে পত্র লিখেছিলেন। কবিতাটি নিম্নরূপ :

শুন মীরাবাই, ওগো শুন মীরাবাই
কি চিঠি লিখেছ তুমি বলিহারি যাই।
কাশি সেরে খুশী আছ শুনে সুখী বড়,
সুখে থাক খেলা কর মন দিয়া পড।
মীরা হবে ভাল মেয়ে তাতে ভুল নাই,
ঈশ্বরচরণে আমি এই শুধু চাই।
ইতি তোমার দাদামশাই।[১]

—ছন্দের খাতিরে এখানে শিবনাথ 'দাদামশায়' নন, 'দাদামশাই হয়ে গেছেন। হয়ত অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এমন বহু অপ্রকাশিত কবিতা রয়ে গেছে।

কুলপঞ্জিকাটিকে অপ্রকাশিত বললে ভুল হবে, বরং বলা ভাল 'অংশত প্রকাশিত'। কারণ হেমলতা দেবী 'শিবনাথ-জীবনী' গ্রন্থটিতে কুলপঞ্জিকার 'বংশলতিকা'টিকে ব্যবহার করেছেন। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় শিবনাথের 'আত্মচরিতে'র দ্বিতীয় (১৯২০) ও তৃতীয় সংস্করণ (১৯৪০) সম্পাদনাকালে কুলপঞ্জিকাটি থেকে তিনটি মন্তব্য 'আত্মচরিতে'র পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।[৩] এ দুটি ছাড়া কুলপঞ্জিকার অন্যত্র ব্যবহার লক্ষ্য করি না।

১। কবিতাটি মীরা দেবীর সৌজন্যে আমি পেয়েছি।
২। কুলপঞ্জিকাটি আমি শিবনাথের পৌত্র শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে পেয়েছি
৩। দ্রঃ, আত্মচরিত (সিগনেট সংস্করণ ১৩৫৯) পৃঃ ১।

'আত্মচরিত' আলোচনা প্রসঙ্গে আমি কুলপঞ্জিকাটি থেকে উদাহরণ দিয়ে এটি যে আত্মচরিত রচনার প্রথম উদ্যোগ ছিল, সেকথার উল্লেখ করেছি। এখানেই কুলপঞ্জিকাটির সাহিত্যমূল্য। আবার বংশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেওয়া শিবনাথের মত ব্যক্তির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল, কারণ তিনি 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে'র লেখক।

কুলপঞ্জিকাটির আরম্ভ এইরূপ :

'ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং
কুল-পঞ্জিকা।
১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ ২৯ নবেম্বর
শনিবার হইতে
আরব্ধ'

গ্রন্থ সূচনা নিম্নরূপ :

'বালিগঞ্জ ২৯ নবেম্বর ১৯০২। আমার বৈবাহিক শ্রীযুক্তবাবু মধুসূদন রাও মহাশয় গত ২৭ নবেম্বর বৃহস্পতিবার তারে সংবাদ দিয়াছেন যে সেই দিন মধ্যাহ্ন ১২টা ৫৮ মিনিটের সময় আমার পুত্র প্রিয়নাথের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। বধূমাতা শ্রীমতী অবন্তী দেবী প্রসব হইবার জন্য পিতৃগৃহে গিয়াছিলেন, সেখানে নিরাপদে পুত্রের মুখ দর্শন করিয়াছেন। আমার আদেশক্রমে প্রিয়নাথ এই খাতাখানি কিনিয়া আনিয়াছেন; ইহাতে আমাদের বংশাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিবে।'

এরপর শিবনাথ তাঁর পূর্বপুরুষ, জন্মস্থান ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। বংশপরিচয় ব্যতিরেকে নিজের বিবাহ, শিক্ষা ও শিক্ষকতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের পর তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে বলেছেন, '১৮৬৯ সালে আমি স্বর্গীয় আচার্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাস ১৮৬৫ সালেই জন্মিয়াছিল। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই আমার ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করিবার ইচ্ছা জন্মে। ঐ কার্যে এখনও আছি।' ১৯০১ সালের ৩রা জুন দিবসে প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী দেবীর মৃত্যুর উল্লেখ করে শিবনাথ কুলপঞ্জিকার প্রথম দিনের লেখা শেষ করেছেন।

২৩-এ আগষ্ট ১৯০৩, ৬ই ভাদ্র ১৩১০ তারিখে লেখা দ্বিতীয় দিনের

দিনলিপিতে শিবনাথ একমাত্র পৌত্র অমরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নামকরণ-অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন।

তৃতীয় দিনের ( ২৭এ নভেম্বর, ১৯০৬ ) লেখাতে 'অমরনাথের জন্মদিনের বিশেষ উপাসনা' ও তাঁর বিদ্যারম্ভের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। মীরা দেবীর বিদ্যারম্ভের কথাও এই প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে।

সবশেষে ( ১লা ডিসেম্বর ১৯০৬ ) শিবনাথ মাত্র চার বছরের পৌত্র 'অমরনাথের বিকাশোন্মুখ চরিত্রের যে যে লক্ষণের আভাস পাওয়া যাইতেছে তাহার কিছু কিছু' লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এখানেই শিবনাথের স্বহস্তে লেখা কুলপঞ্জিকার অংশটুকু সমাপ্ত হয়েছে।

## ॥ ডায়েরী ॥[১]

শিবনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরী[২] শিবনাথের দ্বিতীয় আত্মচরিত। 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' যখন মুদ্রিত হয়, তখন শিবনাথের বিচিত্র কর্মধারা ও সাহিত্যিক চিন্তার একাংশের সঙ্গে অনুরাগীগণ পরিচিত হবার অসামান্য সুযোগলাভে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'তে ইংলণ্ডবাসকালে শিবনাথের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রধানতঃ লিপিবদ্ধ থাকায় তা তার সমগ্র জীবনের উপর তেমন আলোকপাত করে না। আমরা এখানে যে অপ্রকাশিত ডায়েরীটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি, তা এই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। এর মধ্যে যে সমস্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তথ্য আছে, তা শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-কাহিনীকে বহুলাংশে আলোকোজ্জ্বল ও পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। শিবনাথ ব্রাহ্মপ্রচারক, শিবনাথ সাধক, আবার তিনি বিজ্ঞ রাজনীতিক, দায়িত্বশীল স্বামী, স্নেহকাতর পুত্র, অসীম বন্ধুবৎসল, নারীজাতির পৃষ্ঠপোষক, শ্রদ্ধাবান্ পাঠক, প্রকৃতি-প্রেমিক এবং সর্বোপরি প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিক—ডায়েরীর বহু পৃষ্ঠাতেই শিবনাথের এই বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় আছে।

১। ডায়েরীগুলি আমি ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্রের সৌজন্যে পেয়েছি।

২। আমরা ডায়েরীর যে খাতাগুলি পেয়েছি, সেগুলিই যে সব, এমন নয়। ১৮৭৮ সাল থেকে শিবনাথ ডায়েরী রাখতে আরম্ভ করেন—একথা হেমলতা দেবী বলেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে ডায়েরীর যে সব অংশ ব্যবহার করেছেন, আমরা তার আলোচনা করছি না। ১৮৮৪ সালের ৩রা মার্চ থেকে ২৪এ এপ্রিল ১৯১৪ পর্যন্ত ডায়েরী আমরা ব্যবহার করছি। বিচ্ছিন্নভাবে রাখা ৫৮২ দিনের দিনলিপি এখানে আলোচিত হচ্ছে।

শিবনাথের এই বৃহৎ ডায়েরী থেকে আমরা প্রয়োজন মত অংশ উদ্ধার করে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের কিছু পরিচয় উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছি। এতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হবে যে ডায়েরীটি তাঁর 'আত্মচরিতে'র পরিপূরক।

## এক। সাহিত্য সম্পর্কে শিবনাথের ধারণা ও নিজের সাহিত্যিক প্রতিভার মূল্যায়ণ সম্পর্কিত অংশ বিশেষ :—

সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে শিবনাথের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটলেও তাঁর মধ্যে একটি কবি প্রাণ মাঝে মাঝে প্রধান হয়ে উঠত। শিবনাথ নিজেও একথা বহুস্থানে বলেছেন[১]। ডায়েরীর একস্থানে তিনি লিখেছেন, 'এক সময়ে আমি কবিতা পড়িতে ও লিখিতে ভালবাসিতাম, প্রকৃতি ও মানুষকে কবির চক্ষে দেখিতাম। কালক্রমে বিবাদ বিসম্বাদ, ছাড়া-ছাড়ি, ছুটাছুটি, খাটুনি প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়া আমার কবিত্ব আর স্ফূর্তি পাইবার সময় পাইল না। এখন সময় আসিয়াছে—যখন একান্তে ও প্রকৃতির বন্য নিকেতনে বসিয়া আবার কবিতের স্ফূর্তির দিকে মন দিতে হইবে।'—২৩-৯-১৯১১। প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিবনাথের কবি-প্রতিভা সমধিক স্ফূর্তিলাভ করত। ইডেন গার্ডেনে ভ্রমণরত অবস্থায় 'প্রকৃতির শোভা দেখিয়া এক অপূর্ব ভাব মনে' আসায় বহু কবিতার জন্ম হয়েছে। এমন একটি কবিতার অংশবিশেষ :

সারা নিশি ছিলা পড়ি প্রকৃতি সুন্দরী,
মান ভরে নীলাম্বরে আপনা আবরি ;
ঊষাগমে প্রেম কর প্রসারি তপন,
ঘোমটা খুলিয়া মুখ করে দরশন।
এই প্রেমলীলা দেখে যেন পাখীকুল,
কোলাহল করে উঠে আনন্দে আকুল।—৫.১.১৯১০।

এই ইডেন গার্ডেনে লেখা আরও একটি কবিতা—

হিম জলে করি স্নান স্নিগ্ধ ধ্যানরূপ,
তরুলতা ধরিয়াছে শোভা অপরূপ ;
হিম-স্নাত দুর্বাদল প্রাণ মন হরে ;
ধরা যেন প্রেমানন্দে পুলকে শিহরে।—৩০.১.১৯১০।

১। 'আমি···ভাবুক ও কবি হইবার জন্য জন্মিয়াছি। কিন্তু কবিত্বও বুঝি অনভ্যাসবশতঃ মারা যায়।'—অপ্রকাশিত ডায়েরী—৬-৫-১৮৮৪।

কবিতা-প্রসঙ্গ আলোচনাতে তাঁর প্রচুর আগ্রহ ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন। শিবনাথ একদিনের কথা এইভাবে লিখেছেন, 'রামানন্দের সহিত affections সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। আমি বলিলাম modern age-এর একটা লক্ষণ depreciation of the affections.—তিনি বলিলেন এই জন্যই poetry ও Literature ভাল হইতেছে না। আমি বলিলাম imagination ও question সাহিত্যের প্রাণ; তাহার অবনতিতে সাহিত্যের অবনতি অনিবার্য।' —২৯.১০.১৯০১।

গদ্যরচনার নিজস্ব ভঙ্গি সম্পর্কে তাঁর মতামত—'ওজস্বী ভাষাতে লেখা আমার স্বভাব নয়। কেশববাবু বলিতেন— যা করে বা লেখে সকলি simple হইয়া যায়, ওর প্রকৃতিতে simplicity প্রধান গুণ।'

শিবনাথ শেষ বয়সে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময়ে তাঁর একমাত্র ইচ্ছা হত সাহিত্য রচনায় তিনি অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করবেন। ডায়েরীতে লক্ষ্য করেছি তিনি বারবার 'সাহিত্য রচনাতে ও জ্ঞানানুশীলনে' (১৬.১০.১৯০১) নিজেকে নিযুক্ত করার সংকল্প করেছেন। এ থেকে তাঁর অন্তরে সাহিত্যিক তাগিদ বা literary urge কতখানি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। অবশ্য এর মধ্যে ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তক রচনাতেই সমধিক আগ্রহ দেখা যেত।

## দুই ॥ কয়েকটি গ্রন্থ রচনার ইতিহাস ও পরিকল্পনা ॥

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'আত্মচরিত' গ্রন্থদ্বয় আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই অপ্রকাশিত ডায়েরীর কোন কোন অংশ উদ্ধার করে দেখিয়েছি। 'বিধবার ছেলে' উপন্যাসের বহু অংশের সমর্থনেও এই ডায়েরীকে কাজে লাগিয়েছি। সেগুলির পুনরুল্লেখ না করে অপর কয়েকটি গ্রন্থের কথা বলছি :—

(ক) প্রবন্ধাবলি ॥

'প্রবন্ধাবলি' ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি পূর্বে প্রবাসী, প্রদীপ, ভারতী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে শিবনাথের 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শিবনাথ লিখেছেন যে এই গ্রন্থটি সমাপ্ত

হওয়ামাত্র 'অমনি প্রদীপ ও প্রবাসীতে আমার যে সকল প্রবন্ধ অগ্রে বাহির হইয়াছে, তাহা লইয়া বসিলাম, সে সমুদায় হইতে বাছিয়া একখানা বই করিতে হইবে।' ( ১৪.১০.১৯০৩ )। নভেম্বর মাসের মধ্যে এই বইখানি মুদ্রিত করার পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়। '·· যে প্রবন্ধাবলি নামক পুস্তক ছাপিব মনে করিতেছি তাহার কাপি arrange করিতে বসিলাম। এমন সময়ে শশিভূষণ চক্রবর্তী আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঐ গ্রন্থ ছাপা বিষয়ে কথা হইয়া তাঁহাকে কাপি দেওয়া গেল।' প্রথম খণ্ড প্রবন্ধাবলি প্রকাশিত হয়ে গেলে গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশ করার ইচ্ছাও তিনি করেছিলেন ( যথাক্রমে ১১.১০.১৯০৮ ও ১৯.৮.১৯১১ তারিখে )। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কার্যে পরিণত হয় নি।

(খ) 'বিধবার ছেলে' ব্যতীত আরও একখানি উপন্যাস রচনার ইচ্ছা শিবনাথের ছিল ( ১১.১০.১৯০৮ )। টলস্টয়ের জীবনী পাঠের পর তিনি দেশের যুবকদের 'influence' করার জন্য এই উপন্যাস রচনার ইচ্ছা তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল। ( ২১.৫.১৯০৯ )।

(গ) ডায়েরী পাঠে জানতে পারি আরও চারটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের ইচ্ছা শিবনাথের ছিল। (১) এর মধ্যে একটি কবিতাগ্রন্থ—"'প্রসূন প্রক্ষেপ" নাম দিয়া আমার কবিতাগুলি পুনঃমুদ্রিত করিতে হইবে ও নূতন কবিতাগুলি ছাপাইতে হইবে" ( ১৯.৮.১৯১১ )। শিবনাথের মৃত্যুর পর কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'শিবনির্মাল্য' নামে যে কাব্যসংকলন প্রকাশ করেছিলেন ( ১৯২২ ), শিবনাথের এই ইচ্ছার কথা জানা থাকলে হয়ত তিনি তাঁর সংকলনের নাম দিতেন 'প্রসূন প্রক্ষেপ'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শিবনাথ নিজের ছোট কবিতাগুলিকে ফুলের মতই পবিত্র ও সুরভিত মনে করতেন বলেই কবিতা-সংকলনগুলির নামের পূর্বে 'পুষ্প' বা 'প্রসূন' নাম দিতে চেয়েছিলেন। (২)-(৩) "'ধর্মসাধন' নামে একখানি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছাও তাঁর মনে হয়েছিল ; এবং 'Men I Have Seen' বলিয়া ইংরাজী পুস্তক ও 'মনের মানুষ'" নামে তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল[১] ( ২০.৯.১৯১১ )। (৪) শিবনাথের অধ্যাত্মজীবনে

১। 'Men I Have Seen' গ্রন্থের অনুবাদিকা মায়া রায় গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'মহান্ পুরুষের সান্নিধ্যে'। শিবনাথ এর নামকরণ করতে চেয়েছিলেন 'মনের মানুষ'।

চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সে কারণে তিনি বাংলা ভাষায় 'নবভক্তিধর্ম' নামে একটি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন ( ২১.৮ ১৯১০ )। বলা বাহুল্য, 'প্রবন্ধাবলি' ও 'বিধবার ছেলে' ব্যতীত অন্যগুলি প্রকাশিত হয় নি—প্রধানতঃ আর্থিক কারণে।

### তিন ॥ রচনার পূর্ব প্রস্তুতি ॥

কোন ইংরেজি প্রবন্ধ রচনার পূর্বে শিবনাথ কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতেন, ডায়েরীতে তার উল্লেখ আছে। সে কারণে Hindusthan Review পত্রিকার জন্য রামমোহন রায়ের জীবনী লেখার পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'যখনই আমার কিছু ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতে হয় তৎপূর্বে বা সেই সময়ে Thackerayর কোন গ্রন্থ পড়ি। Thackerayর ইংরাজীটা আমার বড় ভাল লাগে, প্রাণটা ভাল ইংরাজীতে অভ্যস্ত করিবার জন্য তাঁর লেখা পড়ি।···বিশেষতঃ Thackerayর novelগুলি আমার বড় মিষ্ট লাগে।··· অবশেষে Rammohan Royএর জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করি' ( ১.৯.১৯০৩ )। ১৭.১৯০৯ তারিখের ডায়েরীতেও এই একই প্রকারের মন্তব্য পাই।

অন্যদিকে ইংরেজি-বাংলা বহু গ্রন্থ পাঠের পর তিনি বাংলা লেখায় হাত দিতেন। তিনি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 'চিন্তা সঞ্চরণ' নামক প্রবন্ধটি রচনার আগে 'Tod's History of Rajasthan' এবং Hunter's Rural Bengal পড়তে আরম্ভ করেন ( ১০.৮ ১৯০৪ )।

### চার ॥ গ্রন্থকীট শিবনাথ ॥

শিবনাথ যে কত বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ পাঠ করতেন এবং পাঠ করে তাদের সমালোচনা করতেন, তার বিচিত্র পরিচয় তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে পাওয়া যায়।

### পাঁচ ॥ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য ॥

মিস্ সোফিয়া ডবসন্ কলেট সম্পাদিত ব্রাহ্ম ইয়ার বুকের খণ্ডগুলি নানা তথ্যের আকর বলে সম্মানিত হয়ে আসছে। মিস্ কলেটের সঙ্গে ইংলণ্ড বাসকালে শিবনাথের গভীর সৌহার্দ্য জন্মে এবং শিবনাথ তাঁকে 'কলেট দিদী'

বলে ডাকতেন। কিন্তু ১৮৮৮ সালের আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে কুমারী কলেটের পত্রালাপ চলছিল। সম্ভবত: ব্রাহ্ম ইয়ার বুক-এর ব্যাপারেই এই যোগাযোগ ঘটেছিল। ১৮৮৪ সালের গোড়ার দিকে মিস্ কলেট অসুস্থ হয়ে পড়লে ঠিক হয় যে, সে বছরের ব্রাহ্ম ইয়ার বুক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হবে। শিবনাথ তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্বময় নেতা। সুতরাং সে বছরের বর্ষপঞ্জী সম্পাদনায় শিবনাথের ভূমিকাই ছিল প্রধান, এ কথা ভাবা অসমীচীন হবে না। শিবনাথ নিজেও লিখেছেন, 'আমি Retrospect ও কেশবচন্দ্র সেনের sketch লিখিব' ঠিক হয়েছিল ( ১৮.৫.১৮৮৪ )।

এ ছাড়া 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা সম্পাদনে শিবনাথের সহযোগিতার কথা পত্রিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। অপ্রকাশিত ডায়েরী পাঠের পূর্বে এই তথ্যগুলি জানার উপায় ছিল না।

**ছয়॥ গুরুবন্দনা॥**

শিবনাথ-রচিত গুরুবন্দনা একটি বিখ্যাত প্রশস্তি কবিতা। সারা পৃথিবীর গুণীদের অনেকে শিবনাথের শ্রদ্ধা ও প্রণাম পেয়েছেন এই কবিতাটিতে। ১৭.২.১৯০৭ তারিখে এই গুরুবন্দনাটির রচনারম্ভ হয়। তারপর দীর্ঘ সাত বছর ধরে বন্দনাটিতে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে, তার বিস্তারিত ইতিহাস এই অপ্রকাশিত ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই রূপ পরিবর্তনের একটি উদাহরণ উদ্ধার করছি। এথেকে গুরুবন্দনাটি যে নিছক নামোল্লেখ মাত্র ছিল না, তার মধ্যে বিচার ও শ্রদ্ধা উভয়ই বর্তমান ছিল, তার প্রমাণ পাবো। রামমোহন রায়কে গুরুকীর্তনে স্থান দিয়ে শিবনাথ লিখেছেন, "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মনিষ্ঠশ্চ রামমোহন আত্মবান্। আত্মবান্ শব্দটি এইজন্য দিয়াছি যে self-respect ও dignity রাজার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। আত্মবান্—অর্থাৎ self-respect, self-control, self-help, serenity ও dignity বিশিষ্ট।"—( ৮.১০.১৯০৭ )।

**সাত॥ মৃত্যু সম্পর্কে শিবনাথের উপলব্ধি॥**

১৯০১ সালের ৩রা জুন শিবনাথের প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী দেবীর মৃত্যু হয়। ইএ মৃত্যু শিবনাথকে অসহনীয় আঘাত দেয়। কারণ এর পর থেকেই

তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিবনাথ লিখেছেন, 'প্রায় দুই মাস হইল জানিতে পারা গিয়াছে যে আমার বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হইয়াছে।' স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটায় মৃত্যুর যে পদধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, সেকথার উল্লেখ করে শিবনাথ আরও লিখেছেন, 'বলিতে গেলে আমার জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইতে যাইতেছে। সেজন্য এই দৈনিক লিপি আরম্ভ করিতেছি।[১] ...সত্য সত্যই মৃত্যু আমার কেশে ধরিয়াছে। এখন প্রতিদিন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া আমার ক্লেশ হইতেছে না। বরং একপ্রকার সন্তোষ ও শান্তি অনুভব করিতেছি।' ( ১৫.১০.১৯০১ )।

অবশ্য মৃত্যুকে তিনি হাসিমুখে বরণ করার জন্য এর পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলেন। জীবনে মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'মৃত্যু আমাদের শত্রু নহে, মৃত্যু বন্ধু, কারণ মৃত্যু ত্রিবিধ উপকার সাধন করে। প্রথমতঃ মৃত্যু আমাদের প্রণয়কে বিশুদ্ধ করিয়া আমাদের হৃদয়কে উন্নত করে, দ্বিতীয় মৃত্যু আমাদিগকে সংসারের অনিত্যতা দেখাইয়া দেয়, তৃতীয়ত ঈশ্বরকে ও পরকালকে নিকটে আনিয়া দেয়'—( ২৪.৪.১৮৮৪ )। খণ্ডিত জীবন এইভাবে মৃত্যুর সন্নিধানে অখণ্ড ও পূর্ণ হয়ে ওঠে, শিবনাথের এই বিশ্বাস এখানে ফুটে উঠেছে।

## আট॥ মাতা গোলকমণি দেবীর মৃত্যুতে শিবনাথের প্রতিক্রিয়া॥

১৯০৮ সালের আগষ্ট মাসে গোলকমণি দেবী সংকটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হন। শিবনাথ অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্তাদি সংস্কারের তীব্র বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মাতার মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ আত্মীয়েরা স্পর্শ করতে চাইবেন না শুনে তিনি পুত্র প্রিয়নাথ মারফৎ 'মার প্রায়শ্চিত্ত দং ২০ টাকা' পাঠিয়েছিলেন। ১৩.৯.১৯০৮ তারিখে তিনি মাকে দেখতে যান, কিন্তু মায়ের মৃত্যু ঘটে। সে প্রসঙ্গে শিবনাথ লিখেছেন, 'আমার মাতার সংযম, স্বধর্ম-নিরতি, কঠিন

১। ১৮৮৫ সালের ১২ই ডিসেম্বরের বহুদিন পর ১৫.১০.১৯০১ তারিখ থেকে তিনি আবার ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করেন। অবশ্য ইংলণ্ডে রাখা ডায়েরীর ( প্রকাশিত ) কথা আমরা জানি।

নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার কথা এই কয়দিন মনে জাগিতেছে, তিনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন ও যাহা সহিয়াছেন তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। হায়! বাধ্য হইয়া এ জীবনে তাঁহাকে কি ক্লেশই দিতে হইয়াছে।' (১৯.৯.১৯০৮)। বেশ কয়েকদিন পর আবার লিখেছেন, 'আমার পরলোকগতা জননীকে যেন ভুলিতে পারিতেছি না। তিনি যেন সর্বদা আমার নিকটে রহিয়াছেন, এবং বলিতেছেন যে জিনিসের জন্য আমাকে এত ক্লেশ দিয়াছ তাহাতে বঞ্চিত থাকিও না।' (১২.১০.১৯০৮)।

এ সব ব্যতীত ধর্মজীবনের নানা প্রসঙ্গে ডায়েরীটি আকীর্ণ। এই ডায়েরীর সঙ্গে আরও একটি ডায়েরীর সন্ধান পেয়েছি। সেটিকে ডায়েরী না বলে বরং শিবনাথের ধর্মজীবনের কড়চা বলাই অধিকতর সঙ্গত। অপ্রকাশিত এই সাধন-ইতিবৃত্তটি ১৮৯১ সালের ২৪এ ফেব্রুয়ারি তারিখে আরম্ভ হয়েছে। এর প্রথম পৃষ্ঠাটি এইরূপ :—

ওঁ শ্রীশ্রীজগদীশ্বরো জয়তি/পারিবারিক ধর্মসাধন/প্রতিদিন পারিবারিক/উপাসনান্তে/বিবৃত/উপদেশ ও প্রার্থনাদি/সংগ্রহ/২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১/খ্রীষ্টাব্দ/মঙ্গলবার/হইতে/স্বাস্থ্যের উদ্দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের/মধুপুর ষ্টেশনে/বাসকালে/আরব্ধ'।

## পরিশিষ্ট ॥ ক ॥

### ॥ ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥

### ॥ ১ ॥

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কর্মজীবন বিচিত্র ও বহুশাখাশ্রিত। এই কর্মধারা প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজকেই কেন্দ্র করে প্রবাহিত হয়েছে। শিবনাথ তাঁর 'আত্মচরিতে'র একস্থানে লিখেছেন,[১] 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে যাহা কিছু করিয়াছি তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ।' অর্থাৎ জীবনের অন্যান্য কাজের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও তার উন্নতিকরণকেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে গণ্য করতেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, শিবনাথ শাস্ত্রী দেবেন্দ্রনাথের আদি সমাজ ও কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ—এই উভয় সমাজের সঙ্গেই এককালে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা কোন একটা ছিন্নমূল বা আকস্মিক ঘটনা নয়। সুতরাং কেবলমাত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শিবনাথের কর্মপদ্ধতি আলোচনা করলে যে ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি জড়িত ছিলেন, তার ইতিবৃত্তটুকু অনালোচিত থেকে যাবে। কাজেই আমরা প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটা খসড়া রচনা করে তার আলোকে শিবনাথের ধর্মকেন্দ্রিক কর্মজীবনের আলোচনা করছি।

#### ॥ ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের প্রথমাংশ ॥

'...ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দু সমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দু সমাজেরই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্‌বোধিত হইয়াছে।'[২] অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব হিন্দু সমাজে অনিবার্য হয়েছিল। রামমোহনের আবির্ভাবকালে হিন্দুসমাজ নবাগত মিশনারীদের বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপে এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলিত হচ্ছিল।

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৫১।
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতপথিক রামমোহন রায় ( ১৮৮১ শক ), পৃঃ ১৩১-৩২।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রামমোহন এসে কলকাতায় বসবাস করতে লাগলেন। কলকাতায় আসার পূর্বে রংপুরে থাকতে তিনি হিন্দুসমাজের কতকগুলি কুসংস্কারকে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ভাবতে থাকেন। বাঙালীর চিত্ত তখনও পশ্চিমাগত আলোকে উদ্বোধিত হয়নি বটে, তবুও রামমোহন যে মানবিকতার যুগ আসছে তাকে বরণ করার জন্য, আধুনিক কালের নূতন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং বাস্তব-জীবনপ্রীতি তথা স্বাজাত্যবোধে সমাজকে উদ্দীপিত করার মানসে সমাজ-সংস্কারে মন দিলেন। এর প্রথম উদ্যোগ দেখা দিল তাঁর ধর্মসংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগের মধ্যে। রামমোহন স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করেছিলেন, হিন্দু সমাজে যে ধর্মাচরণ চলেছে, তার সঙ্গে মনুষ্যত্বের যোগ নেই। সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, জগন্নাথের চাকার নীচে মৃত্যু বরণ ইত্যাদি কুসংস্কার ও বাহ্যিক আচার, ধর্মের সঙ্গে 'has become fashionable'. পুরোহিতদের মধ্যেও তিনি সদাচার লক্ষ্য করলেন না—কারণ মুসলমান আমলে তাদের প্রতিপত্তি ও বৃত্তির হ্রাস ঘটেছে। তাছাড়া কৌলীন্যপ্রথা, বাইজীনাচ প্রভৃতি সামাজিক অনাচার ধীরে ধীরে সমাজের কাঠামোতে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল! তিব্বতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করে এবং উপনিষদাদি ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করে তাঁর স্পষ্টতঃই মনে হল, পৌত্তলিকতা এক অযৌক্তিক আচারমাত্র।

এই সময় বাংলা দেশে বেদান্তচর্চা ধীরে ধীরে মন্দীভূত হয়ে এসেছিল। রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এ ছাড়া ব্রহ্মসম্পর্কীয় আলোচনার জন্য তিনি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করলেন। এই 'আত্মীয় সভা'তেই আসলে ব্রাহ্মসমাজের বীজ প্রথম উপ্ত হয়েছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা-বিরোধী বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদকে প্রয়োগ করা। ঠাকুর পুতুলের দেশে প্রতিমাহীন পূজা প্রচার যেমন অভিনব ছিল, তেমনি এই ব্রাহ্মধর্ম প্রচার স্বাভাবিকভাবেই সমাজের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে গভীর আঘাত হেনেছিল। এই ধর্ম বিচার ও প্রচারের অবাঞ্ছিত সংগ্রামে রামমোহন কেন নেমেছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।[১]

১। 'My constant reflections on the inconvenient, or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindu idolatry, which, more

রামমোহনের চিত্ত ধর্মালোচনার জন্য ব্যাকুল হত বলে তিনি প্রায়ই বন্ধুদের নিয়ে খ্রীষ্টীয় চার্চসমূহে যেতেন। একদিন চার্চের উপাসনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রামমোহনের দুই একেশ্বরবাদী বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব প্রস্তাব করলেন যে, আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের জন্য কেবল মিশনারীদের দ্বারস্থ না হয়ে নিজেদেরই একটা ধর্মকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। 'এই মহৎ প্রস্তাবেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সূত্র হইল।'[১] রামমোহন এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। ধর্মকে সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি রূপে কল্পনার আদর্শকে রূপায়ণের জন্য এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরীকরণের প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত কল্পে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র ( ১৮২৮ খ্রী: ) তারিখে জোড়াসাঁকোর রামকমল বসুর বাড়ীর একাংশ মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ[২] স্থাপিত হল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি ব্রাহ্মসমাজের একটি ট্রাস্টডীড্ সম্পাদিত হল এবং এই বছরের ১১ই মাঘ দিবসে সমাজের নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হল। রক্ষণশীল সম্প্রদায় এবং মিশনারীরা এর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাতে লাগলেন। নবনির্মিত গৃহে যে উপাসনা শুরু হল তা ছিল বিচিত্র। শূদ্রের সম্মুখে বেদপাঠ নিষিদ্ধ ছিল বলে অন্য একটি কক্ষ থেকে তা পাঠ করা হত। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানের একাসনে বসে উপাসনার এমন অনুষ্ঠান পৃথিবীর ইতিহাসে আগে আর অনুষ্ঠিত হয় নি।

## ॥ আন্দোলনের দ্বিতীয়াংশ ॥

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন ইংলণ্ড যান এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবাসেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। রামমোহনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাঁর অনুগামীদের

than any other pagan worship, destroys the texture of society, together with compassion for my countrymen, have compelled me to use every possible effort to awaken them from their dream of error ; and by making them acquainted with devotion the unity and omnipresence of Nature's God.'

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সম্পাদকীয়, আশ্বিন ১৭৬৯ শক।

২। রামমোহন প্রবর্তিত সমাজের প্রকৃত নাম ব্রাহ্মসমাজ'। ব্রাহ্মসভা, ব্রহ্মসভা ইত্যাদি বহু নাম তদানীন্তন কালে প্রচারিত থাকলেও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রথম অনুষ্ঠানে একে ব্রাহ্মসমাজই বলেছেন। বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য—দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, পৃ: ৩১১-১৮।

কেউ ছিলেন না। ফলে স্বাভাবিক কারণেই ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। ১৮৩৯ সালের আশ্বিন মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই দশ বছর (১৮৩০-৩৯) ধরে সমাজের অবস্থা খুবই 'ম্লান' ছিল।

রামমোহনের ধ্যানধারণা ২২ বছরের যুবক দেবেন্দ্রনাথকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করে তিনি রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জীবিত করলেন। ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথ আরও ২০ জন সভ্য সমেত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের (তৎকালীন প্রধান আচার্য) কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এই সমাজের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হল। বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে কোথাও সত্যের দর্শন না পেয়ে তিনি 'আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'কেই ঈশ্বরের 'পত্তনভূমি' বলে প্রচার করলেন। ব্রাহ্মধর্ম দ্রুত বিস্তার লাভ করতে লাগল এবং ১৮৪৫ সালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সংখ্যা ৫০০তে উপনীত হল। আর ১৮৫৯ সালের মধ্যে এই ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৪। আরও একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে অবশ্য আলোচিতব্য। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র সরকার নামে এক যুবক সস্ত্রীক খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্তম্ভে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করলেন এবং স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু নেতা রাধাকান্ত দেব ও ইয়ং নেতা রামগোপাল ঘোষকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন। ফলে 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' স্থাপিত হল। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।[১]

## ॥ আন্দোলনের তৃতীয়াংশ ॥

১৮৫৭ সালে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করে বিশ বছরের যুবক কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সেইমত দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহর্ষি 'হৃদয়ের বড় কাছের' লোকটিকে পেলেন। আত্মশক্তি বলে কেশবচন্দ্র অনতিকালের মধ্যেই

১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃঃ ৬৫।

ব্রাহ্মসমাজের নেতা হয়ে পড়লেন এবং ব্রাহ্মসমাজকে এক উন্নত স্থানে নীত করলেন। স্নেহ ও শ্রদ্ধার চিহ্ন স্বরূপ দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি তারিখে কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

কেশবচন্দ্র ছিলেন ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই তাঁর মতপার্থক্য দেখা দিতে লাগল।

প্রধানত: তিনটি কারণে উভয়ের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। প্রথমত: কেশবচন্দ্র চাইছিলেন সপ্তাহান্তে একবার মাত্র উপাসনার পরিবর্তে প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত:, মহর্ষির নির্ভর ছিল কেবলমাত্র হিন্দু শাস্ত্র। কিন্তু কেশবচন্দ্র ধর্মচিন্তাকে বিশ্বের ধর্মচিন্তা-প্রবাহের সঙ্গে মিলিত করতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত:, ট্রাস্টীর বয়ান বলে সমাজে উপাচার্যাদি নিয়োগের ব্যাপারে সর্বকর্তৃত্ব ছিল দেবেন্দ্রনাথের হাতে। এই অধিকার কেশবচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি। তিনি একটি প্রতিনিধি সভার হাতে এই ভার দিতে চাইলেন।

এছাড়া কেশবচন্দ্র জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সমাজ-সংস্কারে হাত দিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ যুগের দাবীকে অস্বীকার করতে না পেরে ১৩.৪.১৮৬২ তারিখে অব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্রকে উপাচার্যের বেদীতে বসালেন। শুধু তাই নয়, কেশবচন্দ্রের দাবী মত নিয়ম করা হল যে, বেদীতে উপবেশনকালে সূত্রধারী ব্রাহ্মণদের উপবীত ত্যাগ করে বসতে হবে। দেবেন্দ্রনাথ উপবীত ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

কেশবচন্দ্র হিন্দু সমাজের উপর দ্বিতীয় আঘাত হানতে চাইলেন অসবর্ণ বিবাহ প্রচার দ্বারা। এবারে দেবেন্দ্রনাথের সহনশক্তি দুর্বল হয়ে গেল। তিনি ট্রাস্টীর অধিকার বলে পুনরায় সসূত্র ব্রাহ্মণদের বেদীতে বসালেন। হিন্দু ধর্মের আদর্শকে তিনি কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চাইলেন না। কারণ কেশবচন্দ্রের মধ্যে তিনি একটা খ্রীস্টভাব লক্ষ্য করেছিলেন।

মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ সংশ্রব রাখা আর উন্নতিশীল দলের পক্ষে সম্ভব হল না। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে লিখলেন,'আমি তোমার কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না।' কেশবচন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখলেন, 'যতদিন আপনার সংস্কার অন্যায় ও অনিষ্টকর বোধ হইবে, ততদিন তাহাকে নির্যাতন করা, তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য।' এবং শেষ পর্যন্ত

দেবেন্দ্রনাথের কাছে 'পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন বিষয়ে পরামর্শ' চেয়ে পাঠালেন। ফলে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তারিখে কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের' নাম হয় 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'। এই ঘটনার পর থেকে দেবেন্দ্রনাথও নিজেকে অনেকখানি সংযত করে ব্যক্তিগত উপাসনায় গভীরভাবে মগ্ন হলেন। 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' অনেকাংশ মন্থরগতি সম্পন্ন হল।

এই সময়কালের মধ্যে 'আদি ব্রাহ্মসমাজের' পরিচালকবৃন্দের মধ্যে আমরা রাজনারায়ণ বসু (দীক্ষা—১৮৪৬ খ্রীঃ), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরে রবীন্দ্রনাথকে পাই। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আচার্যত্বে ও শম্ভুনাথ গড়গড়ির উপাচার্যত্বে 'আদি সমাজের' কার্য বাহিত হতে লেগেছিল।

## ॥ আন্দোলনের চতুর্থাংশ ॥

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও শিবনাথ লিখেছেন যে তিনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' অপেক্ষা 'আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অধিক আকর্ষণ বোধ করতেন। এর তিনটি কারণ ছিল। (এক) শিবনাথের মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশে' কেশবচন্দ্রের গোষ্ঠীকে বিদ্রূপ করে 'কৈশব দল' বলে অভিহিত করতেন; (দুই) দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে শিবনাথকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন; এবং (তিন) শিবনাথের নিকট আত্মীয় হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

কিন্তু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ আগষ্ট (৬ই ভাদ্র) তারিখে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের' মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের দিনে শিবনাথ কেশবচন্দ্রের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেও এর পূর্বে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সমাজের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে যে নগর-কীর্তন বের হয়, তখনই শিবনাথ তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কেশবচন্দ্রের দলভুক্ত সহাধ্যায়ী বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আকর্ষণে তিনি কেশবচন্দ্রের দলভুক্ত হন। শিবনাথ লিখেছেন, 'সেই আমাকে উন্নতিশীলদলের সঙ্গে যেন বাঁধিয়া ফেলিলেন।' শিবনাথ কিভাবে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সেকথা আমরা পূর্বেই আলোচনা

করেছি। এবং সেই প্রসঙ্গে শিবনাথকে যে কি নিদারুণ নিপীড়ন ভোগ করতে হয়েছিল, তারও উল্লেখ করেছি।

কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে 'ভারত সংস্কার সভার' মাধ্যমে যে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করলেন, শিবনাথ তাতে একেবারে আত্মসমর্পণ করলেন।

১৮৭২ সাল পর্যন্ত শিবনাথ কেশবচন্দ্রকে নানাভাবে সমর্থন করে এসেছেন। মুঙ্গেরের নরপূজার আন্দোলনে তিনি কেশবচন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের তিনি অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৮৭২ সালের তিন আইন ( Act III of 1872 ) নিয়ে হিন্দু, ব্রাহ্ম—সকল সমাজ যখন আলোড়িত, রাজনারায়ণ বসু যখন কেশবচন্দ্রের 'আমি হিন্দু নই' কথার তীব্র প্রতিবাদ করে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক বিখ্যাত বক্তৃতা দান করছেন, সে সময়েও শিবনাথ রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতার বিরুদ্ধে নানা বক্তৃতা দিয়ে কেশবচন্দ্রকে সমর্থন করেছেন। শিবনাথ নিজেই এই বক্তৃতার অসারতার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'এই বক্তৃতা কাহারও কর্ণে পৌঁছিল না' এবং 'এই সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল।' কাজেই দেখা গেল শিবনাথ অন্ততঃ ১৮৭২ সাল পর্যন্ত কেশবচন্দ্রকে সমর্থন করে এসেছেন। কিন্তু শীঘ্রই বিরোধ দেখা গেল এই ১৮৭২ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে।

কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে একটা একতন্ত্রতাকে লক্ষ্য করেছিলেন বলেই গণতন্ত্রের উপর ব্রাহ্মসমাজকে স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ' স্থাপন করেন[১]। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেশব-চন্দ্রের মধ্যেও বর্তমান ছিল। সেটি হল উভয়ের মধ্যে আভিজাত্যবোধ লক্ষণীয় পরিমাণে বর্তমান ছিল। এই আভিজাত্যবোধই পরিণামে কেশব চন্দ্রের মধ্যে একতন্ত্রের ভাব সঞ্চারিত করেছিল। যে মুহূর্ত থেকে তাঁর মধ্যে এই ভাব-পরিস্ফুট হল, সেই মুহূর্তে তাঁর দলের[২] মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল।

১। দ্রঃ, কেশবচন্দ্রের মন্তব্য, বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, পৃঃ ১১৮।

২। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দলগঠনের একটা সুপ্ত ইচ্ছা প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল ছিল এমন মন্তব্য করা অযৌক্তিক হবে না।

এই বিদ্রোহের প্রকাশ প্রধান চারটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল।

এক ॥ দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের পরিবারের কয়েকটি মহিলা মন্দিরের মধ্যে পর্দার বাইরে[১] এসে বসেছিলেন। এজন্যে দ্বারবানেরা নাকি মহিলাদের অসম্মান করে।[২] কেশবচন্দ্র মহিলাদের প্রকাশ্যে বসার বিরোধী জেনে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ ব্যক্তিরা ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীরের বৌবাজারের বাড়ীতে পৃথক উপাসনা সমাজ স্থাপন করলেন। লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে, অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী শিবনাথ এ ব্যাপারে কোন নেতৃত্ব দিলেন না। কারণ মেয়েদের প্রকাশ্যে বসতে দিলেই তাদের পরিত্রাণ ঘটবে, শিবনাথ একথা বিশ্বাস করতেন না। অবশ্য কেশবচন্দ্র সময়ের গতি বুঝে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিলে স্বতন্ত্র সমাজ উঠে যায়। তাছাড়া, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে কেশবচন্দ্র যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, তা নিয়েও মতভেদ দেখা দেওয়ায় দ্বারকানাথ প্রমুখের উদ্যোগে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

দুই ॥ কেশবচন্দ্র যখন স্বীয় সমাজের মধ্যে নিজেকে ঈশ্বরের 'প্রেরিত মহাপুরুষ' বলে প্রচার করতে লাগলেন, তখন একদল ব্রাহ্ম যেমন কেশবচন্দ্রকে তাঁদের পরিত্রাতা ভেবে তাঁর শরণাপন্ন হলেন, তেমনি অপর একদল ব্রাহ্ম যুবক নিয়মতন্ত্র প্রণালীর আশু সর্বনাশের আশঙ্কায় কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। এঁদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রধান। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এঁদের তর্ক-বিতর্কের অন্ত রইল না।

তিন ॥ নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের নিমরাজী ভাব এক দল ব্রাহ্মকে তাঁর বিরোধী করে তুলেছিল। এই কালের মধ্যে আনন্দ-মোহন বসু ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজে একটি নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করলেন। কেশবচন্দ্র প্রথমে বাধা দিয়েও শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে পড়ে প্রতিনিধি সভা আহ্বানে সম্মত হলেন।

১। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কেশবচন্দ্রই ১৮৬৬ সালের মাঘোৎসবের সময় নিজে উদ্যোগী হয়ে মহিলাদের পর্দার বাইরে বসার ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্রঃ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২৫৪।

২। কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত, পৃঃ ১৪৮।

এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত এই সভার প্রস্তাবক্রমে কেশবচন্দ্র ও আনন্দমোহন যথাক্রমে প্রতিনিধি সভার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। অবশ্য সমাজের ব্রাহ্মগণের অসহযোগিতায় কিছুদিনের মধ্যেই সভাটি 'বিযুক্ত' হয়; এতে ব্রাহ্মদের একাংশের মনে অসন্তোষ গুঞ্জরিত হতে থাকে।

এই অসন্তোষ ১৮৭৪ সালে ভারত-আশ্রমে সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফেটে পড়ল। দেনার দায়ে মজিলপুরের হরনাথ বসুকে সস্ত্রীক আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু আশ্রমের ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁর স্ত্রীকে অপমানের সঙ্গে গহনা খুলে দিয়ে পরিত্রাণ পেতে হয়। দারুণ সমালোচনার মধ্যে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে 'সমদর্শী' নামে একটি দল প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করল। শিবনাথ হরিনাভি থেকে এসে এই দলে অনুপ্রবিষ্ট হলেন। ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে সমর ঘোষণা করে শিবনাথ ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দুটি বক্তৃতা দিলেন।

এই বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদে পরিণত হয়েছিল চতুর্থ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে। এই শেষোক্ত আন্দোলনে শিবনাথ সাক্ষাৎভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। সেটি হল, কুচবিহার-বিবাহ আন্দোলন। এর কথা আমরা পূর্বেই 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ' নামক পুস্তিকাটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি। ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে কেশবচন্দ্রের কন্যা (পাত্রী) ও কুচবিহার-রাজ (পাত্র) উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। তাছাড়া বিবাহটি পূর্ণ ব্রাহ্ম মতে অনুষ্ঠিত হয় নি। বিবাহ-মণ্ডপে হরগৌরী নামক 'দুইটি পদার্থ' স্থাপিত হয়েছিল। যে পৌত্তলিকতা-বিরোধী অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মসমাজ সারা বিশ্বে সমাদৃত ছিল, এই ঘটনা দ্বারা কেশবচন্দ্র সারা বিশ্বের সম্মুখে সেই ব্রাহ্মসমাজকেই হেয় করে দিলেন। ইংরাজ সরকারের অভীষ্ট পূর্ণ হল। সামাজিক একটা ঐক্য স্থাপনের মধ্যে তারা রাজ্য শাসনের যে অন্তরায়ের আশঙ্কা করেছিল, সেই ঐক্যস্থাপনার সূচনা-মুহূর্তে তাকে বিনষ্ট করল চক্রী ইংরাজ সরকার।[১] হাতিয়াররূপে ব্যবহার করল তারা কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস ও আনুগত্যকে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দল, সমদর্শী দল ও নিয়মতন্ত্র দলের

১। বিপিনচন্দ্র পাল যথার্থই বলেছেন, 'কেশবচন্দ্রকে কুচবিহারের রাজপুরুষেরা একটা ফাঁদে ফেলিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।'—সত্তর বৎসর, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৪ পৃঃ ৫৯৯।

পর্যায়ক্রমী আন্দোলনের ফলে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যে প্রীতি ক্ষয় হয়ে আসছিল, কুচবিহার-বিবাহকে কেন্দ্র করে তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেল। কেশবচন্দ্রকে অপসারণের চেষ্টা চলতে লাগল। সকলে কেশবচন্দ্রকে একটা মিটিং ডাকার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্র এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের সাহায্যে একটা মিটিং ডাকলেন—'Babu Keshub Chunder Sen will propose, that Babu Keshub Chunder Sen be deposed. সভায় কেশবচন্দ্রের অপসারণের দাবী জানিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী যেই প্রস্তাব তুললেন, অমনি কেশবচন্দ্র সপার্ষদ সভা ত্যাগ করলেন এবং পরে পুলিশের সাহায্য নিয়ে মন্দিরে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। লক্ষণীয় যে, যেদিন মন্দিরে পুলিশের হস্তক্ষেপ ঘটে সেদিন শিবনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। যাই হোক্, ঐ দিনই (২৪.৩.১৮৭৮) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-মন্দিরের পার্শ্বস্থ উপেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে তাঁরা পৃথক্‌ভাবে উপাসনা শুরু করলেন। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই প্রথম পৃথক উপাসনা আরম্ভ হইল।'[১] এখানে শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ প্রতি রবিবার নবপ্রতিষ্ঠিত উপাসনাগৃহে আচার্যের কার্য করতে লাগলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল।

**॥ নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ॥**

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ 'নববিধান' নামে পরিচিত হয়। 'নববিধানে'র ক্রিয়াকর্মে কিছু পরিমাণে দেববাদ স্বীকৃত হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট চিন্তাধারা থেকে 'নববিধান' যথার্থই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। কুচবিহার বিবাহের অনুষ্ঠানে কেশবচন্দ্র পৌত্তলিক-ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি অচিরেই সরস্বতী, কালী ইত্যাদি হিন্দু দেব-দেবীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেন। সান্‌ডে মিরারে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধের মধ্যে কেশবচন্দ্রের এই নূতন মতকে প্রচারিত হতে দেখি। এই হল তাঁর 'নববিধান'। এর পশ্চাতে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের গভীর যোগাযোগ ও রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব বহুল পরিমাণে সক্রিয় ছিল, এমন

১। কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত, পৃঃ ১৫৯।

অনুমান অসঙ্গত হবে না।[১] কিন্তু কেশবচন্দ্রের মত সে যুগের বহুজনেরই বিশ্বাস ছিল যে 'নববিধানে'র আধ্যাত্মিক সমন্বয়ী উপলব্ধি এবং সমাজ-সংস্কারের অবলম্বিত পন্থা উনিশশতকীয় সংস্কার আন্দোলনের সার্থকতর রূপ ছিল। সর্বধর্মের প্রতি, সমগ্র সভ্যতার প্রতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি কেশবচন্দ্রের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। দেশের এই অগ্রগতির সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত হয়েও নববিধান প্রতিষ্ঠা করে কেশবচন্দ্র দেশের অতীত সত্যকে নিয়ে পড়ে রইলেন। ফলে যে সত্য-আনন্দ তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই আনন্দ থেকে তাঁর চতুষ্পার্শস্থ বহুসংখ্যক দুঃখার্ত ও বিভ্রান্ত লোকদের তিনি বঞ্চিত করেছিলেন। সুতরাং জন্মনেতা ও গতিশীল মানব কেশবচন্দ্র, যিনি তাঁর প্রচণ্ড চৌম্বক শক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের রাজদূত হিসাবে নিজেকে পরিচিত করেছিলেন, যিনি শাস্ত্রের চেয়ে মানবিক উপলব্ধিকে, ব্যক্তিতন্ত্রের চেয়ে গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকারকে, সামাজিক শাসনের চেয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে সম্মান দান করতে চেয়েছিলেন,—বৈরাগ্য প্রচারে রত হয়ে, সন্ন্যাসীর ঔদাসীন্য গ্রহণ করে ও এক নূতন আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে প্রচার করে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাক্ষাৎ যোগ থেকে বহুদূরে সরে এসেছিলেন।

পক্ষান্তরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ 'হিন্দু' আদর্শ গ্রহণের ব্যাপারে আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে পৃথক হয়েও দেবেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হয়েছিল বলে তার শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই সমাজের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর যোগ হয় সর্বাধিক। বরং একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সব কিছু কাজই শিবনাথ-জীবননির্ভর ছিল। শিবনাথের বিভিন্নমুখী কর্মব্রত উদ্‌যাপনে আমরা তার কিছু কিছু পরিচয় গ্রহণ করেছি।

পৃথক্ উপাসনা-সমাজ প্রতিষ্ঠা করার পর ব্রাহ্মসমাজ কমিটির উদ্যোগে ব্রাহ্মদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ১৫ই মে তারিখে টাউন হলে একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হল। তাতে 'কুচবিহার বিবাহ দ্বারা যে ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ঐ সভায় উপস্থিত সমস্ত লোক একবাক্যে তাহা

১। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫।

নির্ধারণ' করার পর ঐ সভার[১] প্রস্তাবক্রমে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হল।

বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রথম সম্পাদক ও উমেশচন্দ্র দত্ত এর সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। অন্যান্যদের মধ্যে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ৩৫ জন সাধারণ সভ্য নিযুক্ত হলেন।

এ ছাড়া আরও একটি প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হল—'দুই মাসের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনের জন্য নূতন নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইয়া সভ্য সাধারণের বিচারের জন্য উপস্থিত করা চাই।' অর্থাৎ যে নিয়মতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রচেষ্টা চলছিল, তার রূপায়ণের জন্য সকলের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হল। দেবেন্দ্রনাথও শিবনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে একটি পাকা 'constitution-এ বদ্ধ' করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

নিয়মাবলী রচনার ব্যাপারে শিবনাথের পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী ছিলেন আনন্দমোহন বসু। ব্যারিস্টার আনন্দমোহন সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের দিকে তাকিয়েই ১৮৭৮ সালেই এক আদর্শ সংবিধান রচনা করলেন। অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে এই সংবিধানের আদর্শ সবিশেষ লক্ষণীয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হওয়ার সত্তর বছর আগেই এই সংবিধানে স্ত্রী-পুরুষ-বৃত্তি-আয় ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে সকলের বয়স্ক ভোটদানের অধিকার ( adult franchise ) মেনে নিয়েছিল—এমন কি যখন লণ্ডনসমেত ইউরোপের বহুদেশ এই প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার মেনে নেয় নি।[২]

এই প্রসঙ্গে নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের নামকরণের ঘটনাটিও উল্লেখ্য। কারণ এই নামকরণের মধ্যেও একটা গণতান্ত্রিক আবহাওয়াকে পুষ্টিদান করা

১। সভায় চারশো'র বেশি লোক উপস্থিত ছিলেন। আদি সমাজের পক্ষ থেকে রাজনারায়ণ বসু, ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, রেভারেণ্ড মিঃ হেক্টর সাহেব ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী উপস্থিত ছিলেন। আনন্দমোহন বসু সভাপতি হন। ২৬টি সমাজের মধ্যে ২৩টি সমাজের সমর্থনে, ৪২৫ জন ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকার মতানুকূল্যে ও ২৫০টি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে ১৭০টির সম্মতিক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। ইংলণ্ড এই অধিকার মেনে নিয়েছিল বহু সংগ্রামের পর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে।

হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ( ইনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণেরও অন্যতম ছিলেন ) এই নামটি প্রথম উল্লেখ করেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও ১৫ই মে'র সভায় এই নাম প্রস্তাব করেন। দেবেন্দ্রনাথ এই নাম সমর্থন করলে এই নামই রাখা হয়।[২] অবশ্য এই নামকরণের ত্রিবিধ প্রতিক্রিয়াও অচিরকাল মধ্যে লক্ষিত হল। প্রাচীনেরা এর মধ্যে একটা লঘুভাব লক্ষ্য করলেন, সাধারণ লোকে একে যথেচ্ছ অধিকারের সাধারণ সম্পত্তি ভাবতে লাগলেন এবং সমাজস্থ সভ্যেরা পাছে নিয়মতন্ত্র প্রণালী ক্ষুন্ন হয়, এই ভেবে পরস্পরের দোষ দর্শনে মগ্ন হলেন।[১]

১৫ই মে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হল। এই সমাজের মুখপত্র হিসাবে 'তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা' প্রকাশিত হল ২৯এ মে তারিখে। তাছাড়া ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন তো ছিলই। ১৪নং কলেজ স্কোয়ারে গুরুচরণ মহলানবিশের বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজ কমিটির অধিবেশন বসত। এই সমাজে যে স্বাধীনতার আদর্শ ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র দেখা দিল, তাতে বহু যুবক আকর্ষিত হল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গণেশচন্দ্র ঘোষ, রামকুমার বিদ্যারত্ন ও শিবনাথ শাস্ত্রী—এই চারজনকে প্রথম প্রচারকের পদে বরণ করা হল। অবশ্য ১৮৮৬তে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং আরও পরে রামকুমার বিদ্যারত্ন সমাজ ত্যাগ করেন। গণেশচন্দ্র ঘোষেরও মৃত্যু হয়। একমাত্র শিবনাথই সমাজের কাজে শেষ পর্যন্ত আত্মনিয়োগ করেন।

মহান্দোলনের মধ্যে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ অতিবাহিত হল। এবারে সভ্যেরা সমাজের একটি স্থায়ী গৃহনির্মাণের জন্য উদ্যোগী হলেন। ২১১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ( বর্তমানে বিধান সরণি ) ক্রীত জমিখণ্ডের উপর উপাসনাগৃহ নির্মাণের উদ্যোগ চলতে লাগল। নির্মাণের ব্যয় নির্বাহের জন্য সভ্যেরা প্রত্যেকেই তাঁদের এক মাসের বেতন দান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দেবেন্দ্রনাথ দান করলেন সাত হাজার টাকা ( 'Unconditional Gift' )। এতদ্ব্যতীত সিন্ধিয়া, পাঞ্জাবের সর্দার দয়াল সিংহ প্রভৃতি ব্যক্তি মুক্ত হস্তে দান করলেন।

১। ২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৭৩।

সমাজগৃহের ভিত্তি স্থাপন সম্পন্ন হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঘোৎসবের সময়। বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে ১১ই মাঘ তারিখে বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব ভিত্তি-স্থাপন কার্য সম্পন্ন করলেন।

তিনটি সমাজকে একত্রীকরণের চেষ্টা এই সঙ্গে চলেছিল। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ নিজে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগে ১৮৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে দেবেন্দ্রনাথের গৃহ-প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত রামমোহন স্মৃতিসভাকে উপলক্ষ্য করে এই মিলন-সাধনের চেষ্টা চলেছিল। শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র আসেন নি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে ২।১ জন দর্শক মাত্র এসেছিলেন।

১৮৮০ সালের মাঘোৎসব অর্ধনির্মিত মন্দিরের মধ্যেই চন্দ্রাতপের নীচে অনুষ্ঠিত হল। ১৮৮১ সালে গুরুচরণ মহলানবিশ, রাধিকা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শিবনাথের নিরন্তর চেষ্টার পর মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হল। কীর্তনান্তে ১০ই মাঘ ১৮৮১ সাল মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য সম্পূর্ণ হল।

বিপিনচন্দ্র মন্তব্য করেছেন,'…ব্রাহ্মসমাজ একদিন এদেশে এই যুগে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল, ইতিহাস কখনো তাহা ভুলিতে পারিবে না'।[১] ভোলা যায় না, কারণ তা স্বাভাবিক নয়। ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন ধর্মীয় উপাখ্যান বা উপকাহিনী নয়, তা ভারতের ধর্ম ও সমাজ জীবনের অন্তঃসংঘাতেরই সৃষ্টি। এই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বাঁক ফেরার ইতিহাসের সঙ্গে যে ব্যক্তিটি সর্বাধিক পরিমাণে যুক্ত ছিলেন—তিনি স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী।

১। বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, পৃঃ ১৫৮।